অথ সংসার চরিত্রম্

গচনি

"স্মারম্ স্মারম্ স্বগৃহচরিতম্ দারুভূতো মুরারী"।

—উদ্ভট সাগর।





ডি.এম.লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৬

দাম দুই টাকা পঞ্চাশ ন. প.

৪২, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস
মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ১৬, মার্কাস লেন, কলিকাতা-৭, **শশী প্রেস**
হইতে শ্রীজয়কৃষ্ণ কর কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

গৃহিণীকে

গ্রন্থকার

ভূমিকা

কাহিনীগুলো কান্ত ও কান্তার। মধ্যবিত্ত সংসার—না ঘরকা না ঘাটকা। রঞ্জনের ভাষায় মধ্যবিত্ত থাকেন, "শ্রমিকের অরিজন হয়ে, নয়তো ধনিকের হরিজন হয়ে"। এঁদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, পান্তা আনতে নুন। তাই বর্ত্তমান যুগ চলেছে মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধারায়।

এলোমেলো সংসার চরিত্রের কাহিনীগুলো মধ্যবিত্তের সংসারের আনাচে কানাচে খুঁজে পাওয়া যাবে। উদ্দেশ্য শুধু "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্" নয়। খোঁজার ভার রইল বিদগ্ধ পাঠক সমাজের উপর, দিক্‌নাগের স্থূল হস্তাবলেপের সীমার বাইরে।

ইতি

গ্রন্থকার

পয়লা আষাঢ়

১৩৬৫

সূচীপত্র

১।	সংসার চরিত্রম্	১
২।	স্ত্রিয়শ্চরিত্রম্	১৭
৩।	অর্থম্	৩২
৪।	অনর্থম্	৪৪
৫।	ভাবয় নিত্যম্	৫৮
৬।	দুর্গম পথস্তৎ	৬৯
৭।	পঞ্চাশোর্দ্ধে	৮১
৮।	আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে	৯৭
৯।	শঠে শাঠ্যম্	১০৯
১০।	বস্ত্র হীনঞ্চ যস্তবেৎ	১১৮

সংসার চরিতম্

জীবনের প্রায় সায়াহ্নে একটা সুবিধা ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ঠিক যেন প্রদীপটা নিভে যাবার আগে দপ্‌তেটুকু জ্বলে উঠার মতো। প্রায়ান্ধকার ঘরে একটা হঠাৎ আলোর ঝলসানি।

সবেমাত্র পেন্সন নিয়ে ব্যয় সংক্ষেপের মহড়া দিতে চলেছি, এমনি সময় খবর এল বৃদ্ধ মাতুল লোকান্তরিত হয়েছেন। মাতুল কোন লোকে গেছেন জানিনা, জানবার উপায়ও নেই, কিন্তু ইহলোকের ঐহিক ব্যবস্থার জন্য আমার একবার মাতুলালয় যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

মাতুল ছিলেন নিখাদ কঞ্জুস্। পয়সাটাকে তিনি ভাল ভাবেই চিনতেন। একবার সেটা হাতে এলে বটের আঠার মত লেপ্‌টে থাকৃত। আঙুল গলিয়ে গড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকৃত না।

অপব্যয়ী বলে আমার একটা বিশেষণ সব সময়েই তাঁর মুখে লেগে থাকৃত এবং সেই জন্যেই আমার সংবাদটা নেওয়াও তিনি অপব্যয়ের পর্য্যায়ে ফেলতেন। ফলে সম্বন্ধটা ক্রমশঃ বিস্মৃতির আবরণে চাপা পড়ে যাচ্ছিল। অর্থের প্রয়োজনে সম্বন্ধটা বজায় রাখবার ছোটখাট দুই একটা প্রচেষ্টার ফলে তাঁর কাছে যে ব্যবহারটা পেয়েছিলুম, আজও তার কথা মনে পড়লে বুকটা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠে। পয়সা জমানোর সঙ্গে কঞ্জুস্‌দের একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভাব গড়ে উঠে বটে, কিন্তু সেটা যে কত কঠিন হয়ে উঠ্‌তে পারে, তা একটা চাঁদার খাতা নিয়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেলেই ভাল ভাবেই টের পাওয়া যায়। মাতুলের দুয়ারে ভিখারীরাও উপস্থিত হতে সাহস পেত না।

তাই অনেকদিন আর মাতুলের সংবাদ রাখ্‌তে পারিনি। মাতুলানী

নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গতা হয়েছিলেন; এ খবরটাও আমার কাছে অন্যের মারফতে অনেক বিলম্বে এসেছিল। এরপর সংসারের চাপে মাতুল মন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। শুনেছিলুম, টাকা যাতে কোন কালেও খরচ না হতে পারে এমনি একটা স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য মাতুল উকিল মহলে ঘোরাঘুরি করেছিলেন। এতে কি ব্যবস্থা হয়েছিল, জানতে পারিনি। কৌতুহলও ছিল না। বেল পাকলে কাকের কি? এই নীতি বাক্যটি অবলম্বন করে চুপ করে থাকাই সমীচীন বোধ করেছিলুম।

বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদার ব্যবস্থা করছিলুম। গৃহিণী এসে নাক সিটকিয়ে বললেন, যাচ্ছ তো অজ পাড়াগাঁয়ে। গরুর গাড়ী ভাড়াই লাগবে অনেক টাকা। পেন্সনের টাকাগুলো এমনি ভাবে অজলে, অস্থলে, খরচ করতে চলেছো, সেখানে যদি দেখো বিরাট একটা কদলী বৃক্ষ, তা হলে সংসার চলবে কিসে?

যুক্তিটা অকাট্য। মাতুল যে আমাকে বঞ্চিত করবার জন্য গোপন একটা ব্যবস্থা এর মধ্যে করে ফেলেননি, তা বিশ্বাস করা কঠিন। উড়ো একটা খবর পেয়ে হয়রান হয়ে ছুটে গিয়ে শেষটায় হতাশ হয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা যে প্রবল নয়, সেই বা কে বলতে পারে!

চিন্তিত হয়ে জবাব দিলুম, যদি সত্যই ওয়ারিশ হয়ে দাঁড়াই, তাহলে যথাসময়ে না পৌঁছলে সব তছনছ করে লুটে নেবে।

গৃহিণী বিরক্ত মুখে বললেন, বাঁচতে দেয় না ভাত কাপড়, মলে করবে দান সাগর! সারাজীবন একটা পয়সা দিয়ে খোঁজ নিলেন না, আজ দেবে লক্ষ টাকা! এদিকের অবস্থাটা কি? মাইনে হয়ে গেছে অর্দ্ধেক। কত খরচ সংসারের!

ঈষৎ হেসে বললুম, সংসারটাই তো খরচের। তারই একটা সুরাহারের জন্যই তো যেতে চাচ্ছি।

গৃহিণী রেগে বললেন, সব আমিই খরচ করি, কেমন? যা পাচ্ছ পেন্সন,

তোমাদের অফিসের পিওনরাও তার চেয়ে বেশী পায়, তার আবার বড়াই। তোমার চেয়ে ঢের বেশী রোজগার করেছে কেষ্ট কামার লোহা পিটে। দোতালা বাড়ী তুলবে এখন। লেখাপড়া শিখে কি যে হয়। ভাগ্যিস্ আমি বেশী লেখাপড়া শিখিনি।

জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সম্প্রতি এম্.এ পাস করে আমাদের অফিসেই ঢোকবার চেষ্টায় আছে। মাঝে মাঝে ঠিকা খাটে। আয়ের পরিমাণের স্বল্পতায় গৃহিণীর বিরক্তি ভাব স্বাভাবিক জেনেই চুপ করে রইলুম।

গৃহিণী কপালে দুটো হাত ঠেকিয়ে বললেন, গুরুজনের নিন্দে করবনা কিন্তু তোমার মাতুলের খুরে নমস্কার! এক পয়সার সুনে তিনি মাস চালিয়ে নিলেন। মামী পূর্ব্বজন্মে অনেক ধার করেছিলেন, তাই এ ঘরে এসেছিলেন।

সুখ্যাতিটা কিসে হয় জানিনে। গৃহিণীর উক্তির মধ্যে সত্যতা থাকলেও কেমন যেন বিসদৃশ মনে হল। বিদ্রূপ করে বললুম, না, তোমার মতো উড়নচণ্ডী তিনি ছিলেন না। মাতুলও তাই সঞ্চয় করেছেন বিস্তর। তাতেই একটা সুরাহা হবে মনে করে যেতে চাচ্ছি। "নো রিস্ক, নো গেন—" ঝুঁকি না নিলে লাভের আশা নেই এ তো তোমার জানা আছে।

গৃহিণী গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন। আমিও ততোধিক গম্ভীর হয়ে বিছানা বাঁধা শুরু করলুম।

ইতিমধ্যেই খবরটা বাড়ীর সবার কাছে রটনা হয়ে গেল। বড় ছেলে এসে সহাস্য মুখে শুধাল, জমানো টাকার পরিমাণটা বোধ হয় লাখ খানেক হবে।

অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলুম, তা হতে পারে।

একখানা বইএর পাতা উল্টাচ্ছিল সে। বইটা বন্ধ করে ঘরটায় দু একবার পায়চারী করে সহসা সে বলে উঠল, ব্যাঙ্কিং শেখার ভাল ব্যবস্থা আছে বিলাতে। বড় মার্চেন্ট অফিসে ভাল চাকুরী তাতে পাওয়া যায়। বিলাতী ডিগ্রী একটা না থাকলে চাকুরীর ক্ষেত্রে কোন একটা আশাই করা যায় না। জাহাজ এই মাসেই ছাড়ছে। এতে একটা প্যাসেজ বুক করে ফেলি, কেমন?

অবাক্ হয়ে বললুম, গাছে কাঁঠাল আছে কিনা, তার হদিশ পাচ্ছিনে, আর তুমি গোঁফে তেল লাগাতে চাও। টাকাটা পেলে তে ব্যবস্থা। এখন তার কিছু ঠিক নেই।

একটু অধীর হয়ে জবাব দিল সে, এখন থেকে প্যাসেজ বুক না করলে, জাহাজে সিটই পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ইউনিভারসিটীতেও একটা সিটের জন্য জানাতে হবে।

বিরক্ত হয়ে বললুম, যা ইচ্ছে করগে, টাকা পয়সার দেখা নেই, এখনই হুজুক বাধিয়ে বস্তে চাও।

শ্রীমান দৃঢ় হয়ে বল্লে, পাওয়া গেছেই বললে হয়। তুমি ছাড়া আর তো কেউ ওয়ারিশ নেই তাঁর। সুতরাং দেরী করে সুযোগ নষ্ট করে লাভ কি?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সে চলে গেল। বুঝলুম বিলাতী ভূত মাথায় চেপেছে যখন, তখন সহসা তা আর নাম্ছেনা। সম্প্রতি ঠিকা খেটে কিছু টাকা পেয়েছে, সেটা যাবে আর কি ন দেবায়, ন ধর্মায়।

বিছানার মধ্যে ছোট খাট একটা সংসারের জিনিষপত্র ঢুকানোর ফলে সেটা মোটেই বাগ মানছিল না। দড়িটা দিয়ে ভাল করে বাঁধবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা তাই বার বার করছিলুম এমনি সময় মেজছেলে এসে ঘরে ঢুকল।

শ্রীমান এবার বি, এস সি পরীক্ষা দিয়েছে। আফিসে ঢোকাবার প্রস্তাবনায় তার ঘোর আপত্তি; অথচ করবে কি, আর কি করান চলতে পারে তার কোন ধারণা তারও নেই; আমারও নেই। জোর করে অফিসে ঢুকিয়ে দিই এই ভেবে কিছুদিন হল পালিযে বেড়াতে আরম্ভ করেছে। গৃহিণীও তার দলে যোগ দিয়েছেন।

দড়িটার একপ্রান্ত তার হাতে দিয়ে বললুম, বিছানাটা কসে বাঁধ দেখি।

মেজ বিছানা বাঁধ্তে বাঁধ্তে বলে উঠ্ল, দাদা বললে টাকাটা নাকি এক লাখ হবে।

নির্লিপ্তভাবে বললুম্, তোর দাদার ধারণাটা তাই। পরিমাণটা এখনও

জানতে পারিনি। দুই পয়সাও হতে পারে আবার দশবিশ হাজারও হতে পারে; অবাক হবার কিছু নেই। তোমার দাদামহাশয়ের টাকার থলির পরিমাণ কাক পক্ষীটিরও জানবার উপায় ছিল না।

একটু পরে সঙ্কোচের সঙ্গে সে জানাল, বিজ্ঞান চর্চ্চা করতে হলে নিউইয়র্ক কি ম্যানচেষ্টারে যেতে পারলেই ভাল হয়। বিলাত থেকে একটা ডক্টরেট্ হয়ে আসতে পারলে খুব ভাল হয়।

ছেলের আশা আকাঙ্ক্ষায় পিতৃহৃদয় আনন্দেই উৎফুল্ল হবার কথা। কিন্তু উৎফুল্ল হবার পরিকল্পনা দেখে হাসি পেল। নিষেধ করতেও ব্যথা জাগায় অথচ আকাশ কুসুমে সায় জোগানোও কঠিন। তবু সাহস সঞ্চয় করে বললুম টাকা যদি যথেষ্ট পাওয়া যায়, তখন একটা ব্যবস্থা হবেই।

যদিও এই উক্তিটা শ্রীমানের ভাল লাগ্‌লনা তবু দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌লে, ও পাওয়া যা'বেই।

একটু চুপ করেই আবার বললে, দাদাকে তাহলে আর একটা প্যাসেজ বুক করার কথা বলে আসি। দাদা যাচ্ছে টমাস কুক কোম্পানীতে।

বিছানাটা না বেঁধেই মেজ ত্বরিত পদে চলে গেল। এদের ভাব দেখে অবাক্ হয়ে গেলুম আমি। একটু হেসে আবার গোড়া থেকে বিছানা বাঁধার কাজে লেগে গেলুম্। অন্যমনস্ক ভাবে বাঁধতে গিয়ে শ্রীমান বিছানার অবস্থা কাহিল করে রেখে গিয়েছে।

গৃহিণী ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে হাত দুটো শূন্যে ঘুরিয়ে বলে উঠ্‌লেন, ওরা দুটোই নাকি যাচ্ছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে।

মৃদু হেসে জানালুম্, অন্ততঃ ওদের দুজনার তাই ইচ্ছে, আমার সম্মতি আছে কিনা তা জানবার সময় বা ইচ্ছা নেই ওদের।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, তোমার টাকায় যেতে চাচ্ছে নাকি ওরা! ভারী তো মুরোদ তার আবার বড়াই। ওরা যাচ্ছে ওদের দাদামহাশয়ের

টাকায়। তুমি তাতে বাগড়া দিতে চাও কেন? নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গের এত চেষ্টা কেন?

হেসে বললুম, মাতুলের টাকা এখনও হাতে এসে পৌছেনি, পৌছবে কিনা, তারও ঠিক্ নেই, তবে পৌছলে তার কি গতি হবে তার ঢেউ আগেই এসে গায়ে লাগ্‌ছে। তোমার কিছু দরকার আছে কি?

গৃহিণী ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, আমার দরকারের খোঁজ কবে রেখেছো, সারা জীবনটাই তো জ্বালিয়ে খেলে। কত ভাল ভাল নক্সার গয়না বেরোচ্ছে. এর কোনটাই কি কিনে দিয়েছো একদিন? যা ছিল সে সব পেটায় নমঃ। তিন চার হাজার টাকার কমে কি আর সেগুলো হবে।

দাবীর পরিমাণ শুনে একটু হাসলুম। ঔৎসুক্যভরা মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টায় জানালুম্, এ আর বেশী কি?

আশ্বস্তা হয়ে তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন, মেয়ে দুটোরই গায়ে কিছু নেই। স্কুলে যায় খালি হাতে। বড় মেয়েটির বিয়েতে দিয়েছ স্রেফ্ ফাঁকি! এসব কি আর ধর্ম্মে সইবে? তোমার মাতুলের মতো তুমিও কঞ্জুস হয়ে উঠেছো, আবার তারই টাকার সন্ধানে চলেছো। যক্ষের টাকা আগ্‌লে রেখোনা। সব খরচ করে ফেলো।

দড়িটা কসে বাঁধতে বাঁধতে উত্তর দিলুম, সব হবে, সব হবে। একবার পাশ বইটা হাতে এলে হয়, ত'রপর যার যা ইচ্ছে হয় খরচ করো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, মেয়ে দুটোর স্কুলে যাবার যা কষ্ট। বাস আসে ভোরবেলায়! কতদিন যাওয়াই হয় না ওদের। কষ্ট দেখে চোখে জল আসে। ওদের জন্য একটা আস্তিন নিলে হয় না?

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আস্তিন আবার কি! জামা কাপড়ের আস্তিন দরকার। ওরা তা দিয়ে করবে কি? সেলাই শিখ্‌ছে বুঝি?

গৃহিণী সলজ্জভাবে বল্‌লেন, যা তোমার বুদ্ধি! আমি কি তাই বলছি নাকি? কি যে তোমাদের ম্লেচ্ছ ভাষা। ভাল করে বলাও চলে না। ঐ যে

গো ছোট গাড়ী। স্থাখোনি যতীন ডাক্তার যেটায় চড়ে রোগী দেখে বেড়ায়। ওটার আর কত দাম হবে। খেলনা গাড়ী বইতো নয়। শ দুই হলেই একটা—

হেসে উত্তর দিলুম, বেবি অষ্টিন গাড়ীর দামও কম নয়, বড় গাড়ীর চেয়ে বেশী কম হবে না। তা যাক্! মেয়ে দুটিই শুধু চড়বে আর তুমি শুধু চেয়ে দেখবে, তা কি হয়। কিনতে হলে সবাই যাতে চড়তে পারে এমন একটা গাড়ী কেনা দরকার।

হৃদয়টা টাকা প্রাপ্তির আশায় কেমন যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। দীর্ঘ দিনের অনটন, খরচের বাঁধন আজ যেন সব আলগা হয়ে দেখা দিয়েছে। কোনটাতেই যেন আর কুণ্ঠা প্রকাশের অবকাশ নেই। মাতুল কত টাকা কি ভাবে রেখে গেছেন জানিনে কিন্তু সেটা যদি লাখটাকার আকারেই আমার কাছে ধরা দেয় তবে সেটা প্রয়োজনের তাগিতে আঙ্গুল গলিয়ে বের হয়ে যেতে মোটেই দেরী করবে না। অসংখ্য আসা আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ দিন হল সারা সংসারটাকেই ওতপ্রোত ভাবেই জড়িয়ে ধরে আছে, আজ যদি সময় ও সুযোগের ক্ষেত্র পেয়ে সেটা চরিতার্থ হবার পথ খুঁজে নেয়, তাহ'লে সেটার বাধা দেবার শক্তিই বা কোথায়! পথের মাঝে কতকগুলো কাঁটা বিছিয়ে স্বস্তির প্রচেষ্টায় অস্বস্তিই এসে বাসা বাঁধবে। কৃপণের ধনে আর কৃপণতা করে লাভ কি?

গৃহিনীর নিরাশাও ক্রমশঃ ম্লান হয়ে পড়্‌ছে। ছেলেমেয়েরা তার মনে আশার আলো জাগিয়ে তুলেছে। তাই মোটরের কথায় সায় দিয়ে জানালেন তিনি, তাই কিনো, নতুন মোটরটায় চড়ে গঙ্গাস্নান করে আসা যাবে।

গঙ্গানদীটা বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়। তাই কথাটা শুনে হাসিটা ঠোঁটের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বহিঃপ্রকাশে তাঁর আবার ক্রুদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে।

সেজ এসে ঘরে ঢুকল। কি যেন বলি বলি করেও বল্‌তে পারছিলনা।

সহাস্যে তাই বললুম, তোমার কি চাই, বলে ফেলো। টাকা অবশ্য এখনও পাইনি। তবে কার কি চাই, তার ফিরিস্তি নিতে আপত্তি নেই।

সেজ সঙ্কুচিত হয়ে জানাল, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব আমি। হয় শিবপুর; নয় রুড়কীতে। এখান থেকে পাস করে বিলেতে গেলে আরও ভালভাবে শিখ্তে পারা যাবে।

সেজ সম্প্রতি প্রথম বিভাগে আই, এস-সি পাস করেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার খুব ঝোঁক তার। আরও বার দুই এই অনুরোধ জানাতে এসে অর্থাভাবের দরুন প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিরস বদনে ফিরে গেছে।

সোৎসাহের সঙ্গে জানালুম, বেশ তো, টাকা পেলে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে।

গৃহিণী একটু মধুর হাসি হেসে অনুযোগের সঙ্গে বল্লেন, সকলের আব্দার-ইতো বজায় রইল। ছোটটির কথা তো তোমরা কেউ মনে করলেনা।

ছোটটি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে। সম্প্রতি কবিতা লেখা আরম্ভ করে দিয়েছে। পড়াশোনায় ভাল, কিন্তু কবিতা রোগ মারাত্মক। তার কাব্যভাবের মহিমায় অধুনা ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছি। আমার নাম ছাপানো প্যাডের পাতাগুলো তো কবিতা লক্ষ্মী সব আয়ত্ত করেছেনই, অধুনা হিসাবের খাতা, মায় মূল্যবান দলিলগুলোর পিছনের সাদা পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কবিতায় ভর্তি করে ফেলেছে। সেদিন একটা প্রবল তাড়া খাবার পর সহসা আর ঘেসছেনা কাছে।

ডেকে পাঠালুম তাকে। অনেক সাধ্যসাধনার পরে সে কুণ্ঠিত হয়ে প্রার্থনা জানাল যে কবিতা লেখার জন্য মোটা একটা চামড়া বাঁধান খাতা চাই তার, আর তার সঙ্গে আমার ঝরনাকলমের মতো নতুন একটা ভাল কলম।

হেসে উত্তর দিলুম, আচ্ছা।

নানারকম চেষ্টা করেও সেদিন আর যাওয়া ঘটে উঠলনা। পরের দিন সংসার খরচের মধ্য থেকে অর্দ্ধেক টাকা নিয়ে সন্ধ্যার ট্রেন ধরবার জন্য রওনা হলুম। গৃহিণী বারবার সাবধানে চলার উপদেশ দিয়ে বোধহয় একটু সজল

নয়নেই বিদায় দিলেন। পুত্র কন্যাগণ সোৎসাহে অভিনন্দন জানিয়ে অযথা বিলম্ব না করে ফিরবার জন্য তাগিদ দিয়ে বিদায় নিল।

ইতিমধ্যেই জেনে গেলুম টমাসকুক কোম্পানীতে প্যাসেজ বুক করা হয়েছে দুজনার, গৃহিণী বিভিন্ন জুয়েলারী ফার্ম থেকে নানান ক্যাটালগ আমদানী করে যা পছন্দ করেছেন, তার মূল্য কুড়িহাজার টাকার কম হবেনা, দামী একটা মোটর গাড়ী ক্রয় করারও কথাবার্ত্তা চলছে। ছোট ছেলেটা পর্য্যন্ত দপ্তরী বাড়ী হেঁটে চামড়া বাঁধান খাতার ব্যবস্থা করে এসেছে। টাকাটা যখন পাওয়াই যাবে, তখন বিলম্বে আর লাভ কি? হঠাৎ এতগুলি টাকা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে যাবে ভেবে মনটায় কেমন যেন একটা পীড়া দেখা দিল। এক সঙ্গে সকলের আশাটা পুরণ করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়াটা উচিত হয়নি বলে মনে হল। এখন টাকার পরিমানটা বেশী হলে এ ধাক্কাটা সামলানো যাবে। মাতুল বহু টাকা জমিয়ে ছিলেন, এখবরটা নানান সূত্রেই আমার কানে এসেছে বটে, কিন্তু সেটার পরিমাপটা জানার কোন উপায় ছিলনা।

সারারাত এলোমেলো চিন্তায় ঘুম এলনা। পুরানো বাড়ীটাও অনেক দিন অর্থাভাবে মেরামত করা হয়নি। অনেক টাকা খরচ হবে তাতে। হালফ্যাশানের নতুন বাড়ীগুলোও দেখতে মন্দ নয়। তার একটা কিনে ফেল্‌তে পারলে পুরানোটা ভাড়া দেওয়া যেতে পারে। তাতে আয়েরও একটা উপায় হবে। শুধু খরচ করে গেলেইতো চলেনা। ভবিষ্যতের কথাটাও চিন্তা করা দরকার। ছোট খাট দুই একটা ব্যবসা করলেও মন্দ হয় না। তাতে আয়টা কিছু বাড়বে। একটা কাজ নিয়েও থাকা চল্‌বে। দেহটা বিশ্রাম চায় বটে, তবু কর্ম্মহীন জীবনটাও পীড়া জানায়। সারা জীবনটাই অভাব অনটনের সঙ্গে সংগ্রাম করেই কেটে গেছে। জীবনের সায়াহ্নে যখন সুখের একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, তখন সেটার সবদিক দিয়েই সদ্ব্যবহার করা দরকার।

বিছানাটা খুলে ফেলতে সাহস হলনা। অনেক কষ্টে বাঁধা হয়েছে সেটা।

সংসার চরিতম্

বিছানা খোলার সঙ্গে সঙ্গে গোটা সংসারেই খুঁটিনাটির পরিচয় পেয়ে আরোহীদের কাছে পরিস্থিতিটা হাস্যকর হয়েই ধরা দেবে। বিছানাটা ঠেস দিয়েই রাতটা কাটাতে লাগলুম। হুঁকোর নলটাও বার বার পিঠের সঙ্গে বিঁধে একটা ব্যথার সঞ্চার করল। মাতুলালয় পৌছাবার আগে বিছানাটার সদ্ব্যবহার করার কোন সাহস হলনা।

দ্বিগুণ ভাড়া কবুল করে সন্ধ্যানাগাদ মাতুলালয়ে পৌছান গেল। ভাঙ্গা গাড়ী ও জীর্ণ সরু দুর্গম রাস্তা অতিক্রমণে লাঞ্ছনা ও কষ্ট দেবার কোন ত্রুটি রাখে নাই। সারা গায় তীব্র বেদনা প্রবলভাবে চাড়া দিয়ে উঠল। হাত পা সব যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

অতি জীর্ণ ভগ্ন এক অট্টালিকার পাশে এসে গাড়ীটা থাম্‌ল। লোকজনের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেলনা। ক্ষিধের জ্বালায় পেট বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছিল। পথে খানিকটা শুক্‌নো চিঁড়া উদরে স্থান পেয়েছিল, গাড়ীর ঝাঁকুনিতে সেটা হজম হয়ে কোথায় তলিয়ে গেছে তার ঠিক্ ঠিকানা নেই।

অনেক ডাকাডাকির পর এক বৃদ্ধ এসে দরজা খুলে দিল। চেহারার যা পরিচয় মিলল তাতে অবাক্ হয়ে ভাবলুম, কি করে এই মরনোন্মুখ মানুষটা এসে দরজাটা খুলে দিতে পারল। মাতুলের সঙ্গে দেখা হবার তার আর বিশেষ বিলম্ব নেই।

ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত দেহটা নিয়েই গাড়ী থেকে জিনিষগুলো নামাতে লাগ্‌লুম। গাড়োয়ানটা আমাকে নামিয়ে দিয়েই আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করলনা। রাত্রিবাস করবার সমস্ত অনুরোধই সে প্রত্যাখ্যান করল, উপরন্তু আমার কানের কাছে ফিসফিস করে জানাল, কর্ত্তা. সাবধানে থাকবেন, লক্ষণ ভাল নয়।

বৃদ্ধের কঙ্কালপ্রায় চেহারা, অনুসন্ধিৎসু তীব্র চোখ দুটো, তেলের আলোর স্বল্পোলোকিত জীর্ণ গৃহ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিবেশ তার কাছে ভীতিপ্রদ হয়েই দেখা দিয়েছিল।

পুরানো পরিচিত বাড়ী বলেই এই প্রেতলোকের পরিবেশটা মনের মধ্যে

একটা তোলপাড় সৃষ্টি করলেও অনেকটা সহনীয় হতে পেরেছিল। একটু হেসে গাড়োয়ানকে বিদায় দিয়ে বিছানাটা নিজেই বহন করে ঘরের মধ্যে গেলুম। সাহস সঞ্চারের চেষ্টা সত্ত্বেও কেমন যেন ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল। মনে হল যেন মাতুলের অশরীরী কায়াটা টাকাকে আগলে রেখে সারা বাড়ীটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বৃদ্ধের কাছে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর পাওয়া গেলনা। অধিকাংশ সময় সে তার কাশি নিয়েই ব্যস্ত থাকল। খক্‌ খক্‌ খক্‌। অনর্গল সে কাশি। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠে বুকটা যেন থেমে যাবার উপক্রম হয় তার। তাছাড়া কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক প্রেতায়িত চাহনি। রুদ্ধ একটা ক্রোধ যেন সে চাহনি দিয়ে ফেটে পড়ছিল। বুঝলুম, আমার এই অতর্কিত অনাহুত আগমন তার পছন্দ হয়নি। যক্ষের মত টাকা আগ্‌লিয়ে সে বসে আছে। সেখানে অন্যের প্রবেশ যে মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে করছেনা। তাছাড়া দীর্ঘকাল মাতুলের সঙ্গী থাকায় আমার উপর একটা বিরূপ মনোভাব আগে থেকেই তার উপর সংক্রামিত হয়ে থাকা আশ্চর্য্য নয়।

শুকনো চিঁড়েই কোন মতে গলাধঃকরণ করে জলের সন্ধানে ইতস্ততঃ ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতে লাগলুম। অন্ধকারে কিছুরই পাত্তা পাওয়া গেল না। জিজ্ঞাসা করেও উত্তর মিলল না। এ যেন এক তীব্র অসহযোগ আন্দোলন। অবশেষে জলের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বিছানাটা খুলে নিয়ে বসে পড়লুম। অম্বুরী তামাকটা সেজে নিয়ে কায়েমী হয়ে সবে মাত্র টান দেবার উপক্রম করছি, সহসা বৃদ্ধটি এসে কোন রকম অনুমতি না নিয়েই কলকেটা তুলে নিয়ে বারকয়েক সজোরে টান দিয়ে প্রচণ্ড ধূমোদ্গীরণ আর তীব্র কাশি আরম্ভ করে দিল। বুকের পাঁজরাটা যেন ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম করল। হার্টফেল করে আর কি। আমি হতভম্বের মত বসে রইলুম। কাশির বেগটা কিছু কমবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রচণ্ড ভাবে সে কলকেটা টানতে আরম্ভ করল। এবার কাশিটা আরও প্রবল বেগে দেখা দিল। কাশতে কাশতে এবং ঐ সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে সে কল্কিটা নিয়ে

গৃহান্তরে চলে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অনেক ডাকাডাকি করেও না পেলাম একটা উত্তর, না পেলাম ফিরে কল্কিটা। প্রত্যুত্তরে শুধু কাশির শব্দটাই কেবল পাওয়া গেল। কলকিটা আস্ত রইল, না ফেটে গেল, তারও হদিশ পেলুমনা। অগত্যা ধূমপানের আশা পরিত্যাগ করে ভাঙ্গা দরজাটা সন্তর্পণে বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম।

রাতটায় ভাল ভাবে ঘুম হল না। বিগত রজনীর বিনিদ্র অবস্থায় ঘুমটা প্রবল ভাবে আসারই কথা কিন্তু পরিস্থিতি আর পরিবেশটাই মনকে চঞ্চল করে তুলল। ভাবটা যা দেখছি, তাতে সহজে টাকা পয়সার সন্ধান এরা দেবে না। জলটা ঘোলা করেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। নরাণাম মাতুলক্রমঃ। মাতুলের মত কঞ্জুস না হলেও টাকাটা ছেড়ে দেবার পাত্র আমি নই। রাত্রির পরিবেশের অনাদর দিনের আলোর দৃঢ়তায় কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে নেব।

সারা রাতের এলোমেলো চিন্তার অবকাশে ভোরের বাতাসে ঘুমটা চেপে ধরল। ঘুমটা ভাঙ্গল তাই অনেক বেলায়। বিলম্ব না করে মাতুলের কাগজ-পত্র আর টাকা পয়সার ইতস্ততঃ সন্ধান করতে লাগলুম। সম্বলের মধ্যে দেখা গেল কতকগুলি পুরানো আসবাব পত্র, ভাঙ্গা তোরঙ্গ আর ততোধিক জীর্ণ বাসনপত্র। চারিদিকই জীর্ণতার ছড়াছড়ি। বাক্স তোরঙ্গ খুলতে মোটেই বেগ পেতে হল না। সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে শুধু দেখতে পেলুম, আজে বাজে কাগজ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি, আর কয়েকটা তামার পয়সা। আমার আসবার আগেই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেগুলো সরিয়ে ফেলেছে, সেটা আর বুঝতে বাকী রইল না। কেননা মাতুলের সম্পত্তির দলিল পত্র তো আর উড়ে যাবার কথা নয়। সম্পত্তির ফিরিস্তি যোগানোর চেষ্টায় গ্রামবাসীদের শরণাপন্ন হলুম। তারা সহসা কেউ ভিড়তে চাইলনা। ভাসা ভাসা জবাব দিয়ে পাশ কাটিয়েই চলে গেলেন। মাতুলের অর্থ বা সম্পত্তির কোন পরিচিতি তাতে পাওয়া গেল না।

হতাশ হলুম না এতে। মজুর ঠিক করে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব জায়গাতেই

গুপ্ত ধনের সন্ধানে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলুম। সারা বাড়ীটাই যেন চষে ফেলা হল তাতে। মজুরের খরচ অনেক লাগল। তা ছাড়া বৃদ্ধের রোষ কষায়িত দৃষ্টি পরিস্থিতি দুর্ব্বহ করে তুলল। মাতুলের পুরাতন ভৃত্য, তা ছাড়া মরণোন্মুখ বৃদ্ধ, কিছু বলাও যায় না তাকে। বেচারা যেন ঠকাবার প্রচেষ্টাতেই মৌনী রয়েছে।

সঞ্চয়ের সন্ধান না পাওয়া গেলেও কাগজ পত্র যা পেলুম তা বিপুল দেনার পরিচয়ের সাক্ষ্য দিল। দোকানে বাকী রয়েছে, কয়েক শত টাকার। পুরানো হাওলাতী যত দলিলের দেনারও অন্ত নেই। গ্রামের লোকের কাছেও ধার রয়েছে অনেক। তারা সংবাদ পেয়ে আমার কাছে তাগিদ দিতে লাগল।

অবশেষে গ্রামের লোকেদের সব জড় করে সবচেয়ে প্রবীণ নীলু খুড়োর শরণাপন্ন হলুম। এই খুড়োই আমাকে মাতুলের পরলোক প্রাপ্তির সংবাদটা জানিয়েছিলেন। মাতুলের সঙ্গে জীবদ্দশায় তার সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেও তার আক্রোশটা আমার উপর এ ভাবে আস্‌বে এটা বিশ্বাস করতে মনটা চায়নি।

নীলু খুড়ো জানালেন, তোমার মাতুলের বুড়ো বয়সে ঘোর মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। টাকা টাকা করেই জীবনটা গেল। বুড়ো বয়সে আবার ঠিক করল ব্যবসা করে টাকাটা বাড়াবে। সব টাকা তাতেই খুইয়ে শেষটায় দেনার জ্বালায় ইনসলভেন্সি নিয়ে সেই যে এসে বাড়ীটায় বসল আর বের হত না। মুখ দেখাবার উপায় ছিল কি? সারাটা জীবন আমাকে জ্বালিয়েছে নিজেও তাই জ্বলে পুড়ে গেল। তুমি অনর্থক বাড়ীটা খুঁড়ে অর্থের অপব্যয় করলে। ওতে কি টাকা পয়সা বেরোবে? সেগুলো তো ব্যবসাতে গেছে। দুচারটে গোখ্‌রা সাপ পেতে পার ওতে। যা মান্ধাতা আমলের বাড়ী। ওর জীবনে একবারও চুনকালি পড়েনি তাতে। নাও এখন চষা জমিতে দু চারটে লাউ কুমড়া লাগাও। তাতে যদি দু চারটে পয়সা হয়।

মনে মনে প্রমাদ গুণলুম। কি কুক্ষণেই যে এখানে এসে পড়লুম।

অযথা অনেক অর্থ ব্যয় হয়ে গেল। পেন্সনের অর্দ্ধেক নিয়ে এসেছি। একেই তাতে সংসার চলে না, এখন বাকী মাসটা চালাব কি করে? আসবার সময় তিথি নক্ষত্রটাও দেখে আসিনি। মঘা অশ্লেষা নয় তো!

বললুম, এ খবরটা আগে জানালে অনর্থক অপব্যয়টা হত না।

নীলু খুড়ো অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, তুমি হচ্ছ তার আপন ভাগ্নে। সব দিক দিয়েই তার ওয়ারিশ। তোমাকে না জানিয়ে আর উপায় কি বল? আমাদেরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। বেঁচে থাক্‌তে তো কিছু করনি, এখন শেষ কার্য্যটা করে দিয়ে যাও। শ্রাদ্ধ শান্তিটা ভালয় ভালয় চুকিয়ে দিয়ে যাও। নইলে অমঙ্গল হবে।

আবার অর্থ ব্যয়ের পালা। বিরক্তির সুরে বললুম, শ্রাদ্ধের খরচটা পর্য্যন্ত তিনি রেখে যান নি, এইটাই কি আমাকে মেনে নিতে হবে। তার সম্পত্তির পরিমাণও তো নেহাৎ কম ছিল না।

নীলু খুড়ো উদাস ভাবে জানালেন, ঐ যে বললুম, সব খোয়া গেছে তার, মায় ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটা পর্য্যন্ত। জোর করে বাড়ীটায় বাস করে এসেছে এই মাত্র। বুড়ো দেখে ওকে আর তাড়িয়ে দেয় নি এ পর্য্যন্ত। এখন দখল নেবে। ওর নিজের সঙ্গতি এক পয়সাও ছিল না। এখন তুমিই একমাত্র অবলম্বন। এতকাল বড় চাকরী করে এসেছো, জমিয়েছেও অনেক টাকা। এখন তার সদ্ব্যয় করো। মাতুলের মতো কঞ্জুস্ হয়োনা। দেখ্‌লে তো পরিণাম। শ্রাদ্ধটা ভাল ভাবেই করো। হাজার দুয়েক খরচ করলেই চলবে।

নীলুখুড়ো বলেন কি! যাবার খরচের সঙ্গতি নেই আমার কাছে অথচ ফর্দ্দ দেখাচ্ছেন দুহাজার টাকার। তাছাড়া দেনার লিষ্টও তো মাথার চুলের মতই অগুণ্তি। চারিদিকেই কেমন যেন বঞ্চনা নীতির আভাস ফুটে উঠল। রূঢ়স্বরে বললুম, মাতুল ছিলেন খুব হিসাবী, ডুববার লোক তিনি নন।

আপনারাই তার টাকা সব সরিয়ে ফেলে এখন লম্বা লম্বা ফর্দ দেখাচ্ছেন দেনার। আমি সব ছেড়ে দেব ভেবেছেন।

সমস্বরে প্রতিবাদ উঠ্‌ল। সবাই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দু'একজন হাত গুটোবার চেষ্টায় রত ছিলেন। নীলুখুড়ো তাদের থামিয়ে তিরস্কারের সুরে বললেন, তুমি ছেলের বয়সী, তোমাকে আর কি বলব! তোমার মাতুলের টাকা পয়সা অবশ্য যথেষ্টই ছিল কিন্তু সে সব ব্যাঙ্কের টাকা। তোমার মাতুলানীর বিয়োগের পর মাথার ঠিক ছিল না তার। ব্যবসার ঝোঁকে আকণ্ঠ ডুবে আবার গ্রামেই সে ফিরে এসেছিল। ইনসলভেন্সী নিয়ে ছিল তাই হাজতে পচ্‌তে হল না। সহরে গিয়ে সন্ধান নিয়ো। হাজার গণ্ডা পাওনাদারের সন্ধান মিলবে সেখানে। এখানে খাবে কি তার উপায় ছিলনা। ভিক্ষেসিক্ষে করে দিন কাটাতে হয়েছে। আমরা দশজন ছিলুম, ফেলে দিতে পারিনে, তাই এতকাল প্রাণটা ঠিক ছিল তার। তোমার যা ইচ্ছে হয় করো, কিন্তু যাবার আগে যদি পারো, আমাদের টাকাগুলো মিটিয়ে দিয়ে যেয়ো। না পারো এমনিই যেয়ো, এ নিয়ে নালিশ নেই আমাদের।

উত্তরের কোন অপেক্ষা না করেই তিনি স্থির ভাবে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তিরাও চলে গেল। সব'রই কেমন যেন একটা ঘৃণা আর বিদ্বেষপুর্ণ দৃষ্টি। বিরসবদনে আবার ফিরে এলুম সেই জীর্ণ গৃহে।

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখি বুড়োটার অবস্থা প্রায় শেষ হয়ে পড়েছে। মুখে একটু জল দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে অন্তিম নিশ্বাস ফেলল। অগত্যা গ্রামবাসীদের কাছে আবার ধর্ণা দিতে হল।

নীলুখুড়ো গম্ভীর হয়ে জানালেন, বড় বিশ্বস্ত চাকর ছিল এটা। কি করে যে বেঁচে ছিল এতদিন সেইটাই আশ্চর্য্য। আরও দু'চার দিন হয়তো বাঁচত কিন্তু যেভাবে বাড়ীটা চষে ফেলেছো, সেটা আর ওর বুকে সইল না। এর এক একটা ইট কাঠ ছিল ওর পাঁজরের হাড়।

তিরস্কারটা নীরবে মেনে নিলুম। এছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না।

সংসার চরিত্রম্

সংসার পরিচালনায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে যে পাপ অথবা পুণ্য সঞ্চয় করেছি, তা শুধু ঐ তিরস্কারের বেড়াজাল দিয়েই ঘেরা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তিরস্কারের বুনিয়াদের উপরেই তো পুরস্কারের সৌধ রচিত হয়।

শেষকৃত্যটা আমার হাতেই হল। আরও কয়েকদিন কাটিয়ে অর্থ ও সম্পত্তির জন্য অযথা অনুসন্ধান করে শেষটায় নমোনমো করে শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থাটা সারলুম। নরাণাং মাতুলক্রমঃ কথাটা যে নির্ঘাৎ সত্য, সেটা গ্রামবাসীগণ বার বার আমাকে জানাতে কসুর করল না।

সোনার আংটিটা বিক্রয় করে ফিরে যাবার পাথেয় সংগ্রহ করে গরুর গাড়ীতে আবার চেপে বসে ভাবতে লাগলুম, সারা জীবনের অহেতুকী সঞ্চয় দিয়ে যাকে দেনার পীড়নে আইনের আশ্রয়ে প্রাণ ও মান বাঁচাতে হয়েছিল সংসার জীবনে তার ব্যর্থতা বা সার্থকতার পরিমাপের মানের মূল্য কতটুকু! অর্থ যখন ছিল তখনও তৃপ্তি পাননি মাতুল, অর্থহীনতা যখন কঠিন পীড়া জাগাল তখনও তৃপ্তির অবকাশ ছিল না। সারাটা জীবন অর্থের সন্ধানেই কেটে গেল তার। অথচ সংসার চরিত্রে অর্থহীনতা যে কত বড় অপরাধ তাতো পদে পদে অনুভব করা যায়।

রেলে চাপলুম অবশেষে ক্লান্ত ও রিক্ত অবস্থায়। চোখের সামনে ভেসে উঠল, রোলস্রয়, টমাস কুক কোম্পানীর মাধ্যমে ভাড়া করা জাহাজ, ইনজিনিয়ারিং কলেজের কলকারখানা আর জড়োয়া গয়নার সমারোহ। সারারাত আর ভাল করে ঘুম হলনা।

ফেরবার পথে গঙ্গার ঘাটে কয়েকটা ডুব দিয়ে নিলুম। মনটা অনেকটা হালকা হয়ে এল এতে। বাড়ী ফিরে সংসার চরিত্রের যা পরিচয় পাব তার জন্য মনটাকে একটু শক্ত করে নেবার প্রয়োজন ছিল।

রিক্সা চেপে বাড়ীর দিকে রওনা হলুম্। ভোরের বাতাস মনকে অনেকটা উৎফুল্ল করে তুলছিল। সংসার সমুদ্রে এতকাল বাস করে আস্‌ছি, এর শিশির বিন্দুকে আর ভয় কি?

গুন গুন করে তাই একটা গান ধরলুম্।

স্ত্রিয়শ্চরিত্রম্

অফিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পর বাড়ী ফিরে সবে মাত্র ভাঁজ করা চাদরটা আলনায় রাখতে যাচ্ছি এমন সময় গৃহিণী এসে সঝঙ্কারে জানালেন, এমন অকর্ম্মার মত কুড়ে হয়ে থাক্‌লে কি চলে? বসে বসে থাক্‌বে অথচ খাবার সময় হাজার গণ্ডা ফরমাস!

ক্রোধে কি দুঃখে জানিনে, হাত থেকে চাদরটা নিঃশব্দে পড়ে গেল। গৃহিণী থামলেন না, অনর্গল বলতে লাগলেন, একটুও হুঁস নেই। চোখে কি পোকা পড়েছে নাকি? কলকাতা সুদ্ধ লোক ইলিশ কিনে বাজার উজাড় করে ফেলল, আর তুমি এলে আপিস থেকে খালি হাতে। একটুও কি মায়া ধর্ম্ম নেই।

চাদরটা আবার হাতে তুলে নিয়ে জানালুম, চা এক কাপ খেয়ে গেলে হত না?

চোখ দুটো কপালে তুলে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, তবেই হয়েছে। হাজার গণ্ডা ইলিশ এসে লাফিয়ে পড়বে তোমার কাছে। এখন গঙ্গার ইলিশ যে ডুমুরের ফুল তা জান?

জানিনে, এটা স্বীকার করতেই হল। আজকাল বাজারে এটার আমদানী হামেশাই হয়ে আসছে। পকেটের চিন্তায় ওসব সুদুর্লভ কল্পনাও বড় আসে না। এই সুদূর গলি পথে ঐ মহামূল্য দ্রব্যটীর পরিচয় সহজা হবে না, এ ভরসাও কম ছিল না।

গৃহিণী ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশ করলেন, ভাগ্যিস মনীষা এসেছিল, তাই জানতে পারলুম। ওদের বাড়ীতে রোজই আসছে ইলিশ।

মনীষা ছোট শ্যালিকার নাম। ওঁরা আবার সিলেটী চুনের ব্যবসায় ফেঁপে উঠেছেন। ভাবতে লাগলুম সওদাগরি অফিসের ফাইল বাঁধা দড়ি

২

দিয়ে এই অর্থ নৈতিক ব্যবধানের বিরাট ফাঁপানো ফাটলটাকে আট্‌কে রাখা যায় কি প্রকারে?

ব্যাগ্‌টা হাতে এনে দিয়ে তিনি জানালেন, বড় দেখে একটা কিনে এনো কিন্তু। সস্তায় পচামাছ কেনা তোমার আবার চিরন্তন অভ্যাস।

অগত্যা উঠ্‌তে হল। বাইরে তখন সন্ধ্যার ছায়া ক্রমশঃ নেমে আস্‌ছে। হেমন্তের শীতের আভাসে সারা দেহটায় একটা মৃদু শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছিল। চাদরের ভাঁজ খুলতে সেই সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোতেও কেমন যেন এটকা লজ্জা বোধ বচ্ছিল। ভেতরটাতে আর কোন পদার্থ নেই তার। সস্তায় কাচাতে গিয়ে অনেকগুলো জানালা বেরিয়ে গেছে। ভাঁজের মধ্যে তাই তাদের সযতনে ঢেকে রাখতে হয়। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী ভেদ করে শীতের শিহরণ দেহটাকে কম্পমান করে তুলল। গৃহিণী কথিত অকর্ম্মণ্যতার অপবাদ দূরীকরণ মানসে শীতের প্রাবল্য উপেক্ষা করে বাজারের দিকে অগ্রসর হলুম।

মাছ কেনার প্রয়াস যেন ব্যর্থতায় রূপান্তরিত হতে চলল। মাছের সংখ্যার চেয়ে গ্রাহকের সংখ্যা নূন্যপক্ষে চর্তুগুণ। আমদানী আজ মোটেই নেই। ক্রেতারাও সবাই যেন মরিয়া হয়ে এসেছেন অনেকটা আমার মতই। মাছ কেনা তাদের চাই যেন তেন প্রকারেণ। কেউ জায়গা ছেড়ে দিতে চান না। এ যেন, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্রমেদিনী।

সভয়ে ক্রেতাদের কাছে প্রস্তাব জানালুম, একটা কিউ করে দাঁড়ান মশায়। সিনেমার টিকিট পর্য্যন্ত কিউ করে কিনতে শিখেছেন আর মাছ কিনতে শেখেননি?

যাঁরা চক্রব্যূহের বাইরে ছিলেন, তাঁরা আমার কথায় সমর্থন জানালেন। ব্যূহের ভিতরে আমার কথা প্রবেশ করল কিনা জানা গেল না। অবস্থা যেমন ছিল তার চেয়েও ঘোরতর সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াতে লাগল। বাইরে থেকে ভেতরের ব্যাপার কিছু মাত্র জানবার উপায় নেই। শুধুমাত্র সৌর জগতের

বিক্ষিপ্ত তারকার মত দু'একজনকে চক্রব্যূহের বাইরে ছিটকে পড়তে দেখা গেল। মুখে তাদের জয়োল্লাসের ছাপ দেখে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের কথা মনে পড়ে গেল।

মাছ না নিয়ে ফিরে যাব, না মনীষাদের বাড়ী গিয়ে মাছ কেনার জন্য তাদের ভোজপুরীটার সন্ধান নেব ভাবতে লাগলুম। ভিড়ের যা চাপ তাতে আমার মত লোকের নাক গলানো অসম্ভব। অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শেষটা ফেরার সঙ্কল্পই করলুম। ফিরতি পথে দু'এক পা এগোতেই আশুদার সঙ্গে দেখা। ব্যাগ হাতে দীর্ঘ পদবিক্ষেপে তিনি ভিড়ের দিকে এগিয়ে চলেছেন মাছ কেনার আশায়।

চোখে চোখ পড়বামাত্রই তিনি বলে উঠলেন, ইলিশ মাছ। বড় গোছের একটা কিনতে হবে।

ঈষৎ হেসে ভিড়টা তাঁকে দেখিয়ে দিলুম।

মুখব্যাদানে সবগুলো দাঁত বের করে হেসে তিনি জবাব দিলেন, জানি, সেজন্যই এসেছি, খাকী কোটটা পরে। ভায়া হে. মাছ না কিনে ফিরে যাবার উপায় নেই।

মৃদু হেসে ঠাট্টাকরে বললুম, কেন, গৃহিণীর তাড়া বুঝি খুব? আশুদা চক্ষু প্রসারিত করে ডান হাতের তালুতে ব্যাগটা রেখে বাঁ হাতে গোটা দুই তুড়ি দিয়ে জবাব দিলেন, ঠিক তার উল্টো। অর্থাৎ গৃহিণী সম্প্রতি পিত্রালয়ে তাই এই দুঃসাহসিক উদ্যম। নইলে তাঁর বরাদ্দ দৈনিক পাঁচ আনা। এর কমতি ছাড়া বাড়তি নেই। ইলিশ মাছও বাজেট হয় না। তাতে আঁশও জুটবে না। এই মাত্র গৃহিণীকে পিত্রালয়ে পৌছে দিয়েই ব্যাগটা নিয়ে ছুটে এসেছি।

ভাবতে লাগলুম, আশুদার সঙ্গে বন্ধুতা বহুদিনের। মহানগরীর বন্ধুত্ব সব সময়ে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত পৌছয় না। আশুদার অন্তঃপুরের ব্যয় সঙ্কোচের পরিচয় পেয়ে মনে হল, সদর দরজার পরিচয়টা যদি খিড়কীদরজা

পর্য্যন্ত এগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে উভয় গৃহিণীর আন্তঃপুরিক পরিচয়ে ব্যয়সঙ্কোচের সম্ভাবনাকে অবহেলা করা চলে না। বাজেট আমার বেড়েই চলেছে আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতি রেখে। তাই মাসের শেষে দুর্মূল্য ইলিশ কেনার মত দুর্ভোগ আর নেই।

আশুদা বললেন, খালি হাতে যে, মাছ নেবে না?

বললুম, নেবো বলেই এসেছি, কিন্তু নিতে পারছি কই? যা ভিড়!

ভেবেই আকুল।

আশুদা নাসিকা কুঞ্চন করে বললেন, বৃথা ভেবে লাভ কি ভায়া, দুর্গা বলে ঝুলে পড়।

ঘটনাটা সত্যিই তাই। চক্রব্যূহে একবার ঢুকে পড়লে ব্যূহাবিষ্ট জনতার চাপে দোদুল্যমান অবস্থানে ধরণীর স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পাঁজরটাও যে অক্সিজেন নেবার ব্যাকুল আগ্রহে বারবার উঠানামা করবার অবকাশ পাবে না, সেটাও ঠিক। অঙ্গাবরণের অবস্থা তো সহজেই অনুমেয়। ভাবলুম, নিজের ক্ষমতা যখন সীমার বাইরে যেতে সাহসী হচ্ছে না, তখন দুঃসাহসী বন্ধুটির সাহায্য নিতে আর আপত্তি কি! সভয়ে বললুম, পরোপকার পরম ধর্ম্ম, আশুদা। তুমি তো মাছ না কিনে ছাড়বেনা দেখছি। সুতরাং একটার জায়গায় তোমার ব্যাগে দুটোকেই স্থান দাও, তাহলে পরকালে জবাব দেবার একটা সুযোগ পাবে।

আশুদা হেসে বললেন, গৃহিণীর কৃপায় দিনে দুবার গঙ্গায় নাইতে হয় ভায়া। সাঁতারটাও একটু আধটু জানি, কাজেই বৈতরিণীটায় আটকাব না। পরকালের জবাবদিহি বরঞ্চ সহজ, কিন্তু ছেলেদের কাছ থেকে দু দফায় ইলিশ মাছ কেনা পোষাবেনা। ওরা তো গৃহিণীর ভাই-এর সামিল—দাম যা হাঁকে।

একটা দশটাকার নোট জোর করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললুম,

কিনে দিতেই হবে দাদা, যে কোন দামেই হোক না কেন? খালি হাতে ফেরা চলবে না।

আশুদা অনিচ্ছায় সঙ্গে টাকা নিয়ে চক্রগৃহের আনাচে কানাচে ঢুঁ মারতে আরম্ভ করে দিলেন। খানিক পরে হতাশ হয়ে নোটটা আবার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন, সুবিধা হলনা ভায়া, ঢোকা গেলনা। নিজে নিজে একবার শেষ চেষ্টা করে ছাখো। আমার উপর নির্ভর করে সুবিধা হবে না। ঐ যে কথায় বলে, আপনি আচরি ধর্ম—। ঢুকেই পড়না একবার।

আমাকে আর কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে তিনি জনান্তরালে সরে পড়লেন। পরিচিত মুখের কাউকেও দেখতে পেলুম না। খালি হাতে ফিরে যেতেও কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল।

অগত্যা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে নিপিষ্ট জনতার গোলাকৃতি দেহে চতুষ্পদী জীবের মত ঢুঁ মারতে আরম্ভ করলুম। মাথাটা অনেক কষ্টে ইঞ্চি তিনেক ঢোকাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ইঁদুরের জাঁতি কলের মধ্যে পড়ে গেল। আর্ত্তনাদ শুনে কোন সহৃদয় ক্রেতা পেছন থেকে কানসুদ্ধ মাথাটা টানাটানি আরম্ভ করলেন। ভিড় থেকে যখন মাথাটা রক্ষা পেয়ে ফিরে এল, তখন কানদুটো লাল হয়ে উঠল, সেটা ভিড়ের চাপে কি ভদ্রলোকের হাতের গুণে সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলুমনা।

জেদ্ চেপে গেল। মাছ না কিনে আর ফিরে যাবনা। দেরী করলে মাছের আঁশও জুটবে না। কিন্তু চক্রব্যূহে ঢোকবার উপায় না জানায় বারবার হতাশ হয়ে ঘূর্ণ্যমান হতে লাগলুম।

কখন কিভাবে জানিনে. নিজেকে আবিষ্কার করলুম চক্রব্যূহের ঠিক মাঝখানে, ইলিশ মাছ পরিশোভিত মৎসাধারের ঠিক সাম্‌নে। আমার অবস্থাটা তখন অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মতো, না স্বর্গে, না মর্ত্ত্যে। চারিদিকের প্রচণ্ড চাপে পিষ্ট দেহের গ্লানি যেন সরষে ফুলের আকারে চোখের সামনে

নেচে বেড়াতে আরম্ভ করল। দশটাকার নোটটাও উত্তেজনার আতিশয্যে কম্পমান হস্তে ঘর্ম্মসিক্ত হয়ে উঠল।

পাঁচ টাকার এক পয়সা কমে হবেনা বাবু, মাছ রেখে দিন, জেলেটার ক্রুদ্ধ নিনাদ ফেটে পড়ল।

হুঁস হল এ কথায়। ছোট একটা মাছ। সের খানেক ওজন হবে কিনা নন্দেহ। তারই দাম পাঁচ টাকা। জেলেটা বলে কিগো।

ক্রেতা ভদ্রলোক বিরস বদনে জেলেটাকে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু জেলেটা তার কথায় কানই দিলনা। বারবার দরদস্তুরে বিরক্ত হয়ে জেলেটি মাছটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ডালার উপর রাখল। ভদ্রলোক ক্রোধেই হোক আর অর্থের অপ্রতুতলতার জন্যই হোক্. মাছটার মায়াত্যাগ করে বহির্গমনের ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন।

চকিতে মাছটা তুলে নিয়ে দশটাকার নোটটা জেলেটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, বাকীটা ফেরৎ দাও।

দরদস্তুর করে মাছ কেনার সুযোগ ও পরিস্থিতিও প্রতিকূল। কোনমতে মাছটা নিয়ে বের হতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

জেলেটা একরাশ ভাঙ্গানী দিয়ে অন্য ক্রেতার দিকে ঝুঁকে পড়ল। মৌমাছির মতো ঘিরে রয়েছে তাকে। অবসর তার নেই।

ভাঙ্গানীগুলো গুণে নেবারও উপায় নেই। মুঠোর মধ্যে সে গুলো শক্ত করে রেখে বহির্গমনের চেষ্টায় রত হলুম। পরিধির চাপে বারবার কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসতে হল। অসহায় অবস্থায় মনে পড়ল, চক্রব্যূহে বহির্গমনের পথ জানা না থাকায় অভিমন্যুর ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধ করার একটা ম-স্তাত্ত্বিক অবদান ছিল।

পাঞ্জাবীটার বোতাম ছিঁড়ে যাওয়ায় একটা সেফটীপিন লাগিয়ে রেখেছিলুম এখন সেটাই কাজে লাগল। বারবার ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে সেটা খুলে নিয়ে সরীসৃপের মতো এগোতে লাগলুম। সেফটীপিনের

সুচিক্কণ আঘাতে মাঝে মাঝে দুই একটা অস্ফুট আর্তনাদ জনতার কলরোলে মিশে গেল। আমিও ঐ সঙ্গে আমার বের হবার পথ রচনা করে ফেললুম।

"ও মশাই আপনার জামা কাপড়ের দফা যে নিকেশ হল।" কে যেন বলে উঠলেন।

শশব্যস্তে চেয়ে দেখি আদ্দির জামাটার পিছনের দিকটা জনতার মাঝে রেখে এসেছি। চাদরটার অর্দ্ধেকটাও ছিঁড়ে অবশেষে মায়া কাটাতে না পেরে ধূল্যবলুণ্ঠিত অবস্থায় পেছন তাড়া করে আসছে। মাছটা দেখলুম, আস্তই এসেছে। টাটকা মাছটার বক্রদেহের রোপৌজ্জ্বল মহিমায় এই নিদারুণ ক্ষতিটাও যেন সহনীয় হয়ে উঠল।

হঠাৎ আশুদাও ছিট্‌কে পড়লেন এসময়। আশুদা যে কখন ঢুকে পড়েছিলেন, টেরই পাইনি। হাতে তার দোদুল্যমান একটা মাছ। আকৃতিতে আমারটার চেয়ে একটু যেন বড়ই মনে হয়, কিন্তু কেমন যেন লাগছে একটা ছাপ।

প্রশ্ন করবার অবকাশ না দিয়ে বললেন তিনি, তিনটাকার একপয়সা কমে ছাড়লনা। কত সাধ্য সাধনা করলুম, কিন্তু অজন্তুসটা যেন হিমালয় পাহাড়। নট নড়ন চড়ন। অচল টাকা দুটোই তাই চালিয়ে দিলুম। বোঝ বাপধন এবার। তা তোমারটা কতয় হলো?

ভাঙ্গানীগুলো তার হাতে দিয়ে বললুম, এই ভাঙ্গানীগুলো একটু গুণে ন্যাখো দাদা, আমি চাদরটা একটু গুছিয়ে নিই। এটা আবার ছিঁড়ে গেল।

আশুদা ভাঙ্গানীগুলো নিয়ে একগাল হেসে বললেন, ভায়াহে, শুধু চাদরটাই নয়, পাঞ্জাবীটাও নিরুদ্দেশ। ঐ হাফ পাঞ্জাবীটা খুলে মাছটা জড়িয়ে নাও তাতে। ওটা গায়ে দিয়ে বাড়ী ফিরবার পথ পাবেনা। সবাই মিলে রাঁচী পাঠিয়ে দেবে।

একটু হেসে চাদরটা গুটিয়ে নিলুম। পাঞ্জাবীটা খুলে নিয়ে মাছটাও তাতে জড়িয়ে নিলুম।

আশুদা ভাঙ্গানীগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, পাঁচটা আধুলিই দেখছি জাল। খুচরোর মধ্যেও রয়েছে কতকগুলো। কোত্থেকে এগুলো জড় করলে ?

নির্লিপ্তভাবে ভাঙ্গানীগুলো চাদরের খুঁটোয় বেঁধে উত্তর দিলুম, অচলগুলোর সব হিসেব না মিললে মাছটার দাম কত পড়ল বলা সম্ভব নয়। জেলেটা সব অচল চালিয়েছে দেখছি।

আশুদা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, বল কিহে, দেখে নাওনি বুঝি। গুণে ছাখো, অচল কত নিয়েছ।

গুণে দেখলাম পুরোপুরি তিন টাকার খুচরোই দিয়েছে জাল। হতাশ হয়ে বললুম, ড্যাহা ঠকিয়ে নিলে দেখছি। এখন কি আর ফেরৎ নেবে এগুলো।

আশুদা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, নেবেনা কি রকম। আলবৎ নিতে হবে। না নিলে আমরা এত লোক সব ছেড়ে দিয়ে যাব। টাকা না দিলে আর একটা মাছ তুলে নিয়ে এসো। ফেরৎ নেবেনা অচল, আব্দার· আর কি ?

সাহস সঞ্চয় করে বললুম, আশুদা, তুমি যদি নিজে একবার চেষ্টা করে দেখো, তা হলে—বাধা দিয়ে আশুদা বললেন, সে কি হয় ? আমাকে বদলে দেবে কেন ? তোমাকে দিয়েছে অচল, তোমাকেই পাল্টে আনতে হবে। যাও, এখনি আবার ঢুকে পড়। ছেঁড়া গেঞ্জিটার উপর আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কি ? আমি বরঞ্চ তোমার ঐ হাফ্ পাঞ্জাবীটা পাহারা দিচ্ছি।

আশুদা ঠেলে এগিয়ে দিতে লাগলেন। অগত্যা গেঞ্জি গায়েই আবার অতিকষ্টে ঢুকে পড়লুম। কি করে যে আবার ঢুকতে পারলুম, তা নিজেরই বারবার অসম্ভব অভিযানের সাফল্য বলে মনে হল।

জেলেটি সেয়ানা ঘুঘু। অচল চালিয়ে দেবার পদ্ধতি তার ভালভাবেই জানা আছে! তাই এগুলো সে ফিরিয়ে নিতে চাইলনা; বরঞ্চ এমন একটা ভাব দেখাল যে আমিই যেন জোর করে তার কাছে অচল চালাতে এসেছি। ক্রেতারাও আমার উপর বিদ্রূপ বাণী বর্ষণ করতে কুণ্ঠিত হলেন না। আমি যে গেঞ্জি বেশধারী গুণ্ডা প্রকৃতির লোক এবং অচল চালানোই আমার ব্যবসা এটাও কেউ কেউ মন্তব্য করতে ভুললেন না।

হতাশ হয়ে সহানুভূতির প্রত্যাশায় এদিক ওদিক তাকাতে লাগলুম। পরিহাস বক্তা ছাড়া সাহায্যকারীর সন্ধান মিলল না। পরন্তু আমার বেশ ভূষণ, এবং দৈহিক অবয়বটা অচল চালানোর পেশার অনুকূল, একথা কানে ভেসে আসতে লাগল। আমি যে সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক এবং একটা বিরাট দল আমারই আশে পাশে অনুগামী হয়ে আছে, কাজেই সাবধানতা আবশ্যক, একথাও শোনা গেল। কে যেন বলে উঠলেন, পকেটমার লোক নজদীগ হ্যায়। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে নিজ নিজ পকেট সামাল করতে শুরু করে দিলেন।

লজ্জিত হলুন এই ব্যবহারে। রাগ ও ক্ষোভটাও যে পীড়া দিচ্ছিল না তা নয়। চিরকাল ওদুটো চেপে রাখাই অভ্যাস। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতেও দুটো মাঝে মাঝে প্রবলভাবে জেগে উঠতে লাগল। অতি কষ্টে সে দুটোকে দমন রেখে বের হবার উপক্রম করলুম।

বিজলী আলোটা উপর থেকে তীর্ককভাবে এসে পড়েছিল সবার মাথার উপর। পরস্পর সন্নিবিষ্টতার ফলে দেহের সব অংশটায় তার প্রতিফলন হচ্ছিল না বটে কিন্তু আনাচে কানাচে যেটুকু দেখা গেল তাতে আমার মত অবস্থা সকলের না হলে ত সুস্থ দেহে কেউ এ চক্রব্যূহ অতিক্রম করতে পারবে না। পাঞ্জাবীর অবস্থা ব্যক্ত করে জনতার অপবাদ থেকে নিজের মুক্ত হবার চেষ্টা কলরোলে ভেসে গেল। কতিপয় শক্তিমান ব্যক্তি

বোধ হয় আমার ন্যায় অসৎ থেকে মুক্ত হবার প্রচেষ্টায় জনতার মাঝে ধাক্কা দিয়ে বাইরে পৌঁছে দিল।

ভাবলুম, শ্রীঘরে পৌঁছবার ব্যবস্থাপনায় দু'চারজন তথাকথিত সহৃদয় ব্যক্তি পিছু নেবেন কিন্তু সে সব কিছু লক্ষণ দেখা গেল না। জনতা তার ক্রমবর্দ্ধমান গতি নিয়েই চলল।

বাইরে এসে আবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। দামটা আর আনুষঙ্গিক খেসারৎ ধরে মাছটা বহু মূল্য হয়েই আমার কাছে দেখা দিল বটে; কিন্তু এটা যে কলম্বসের বিজয় অভিযানের মতই সার্থকতায় ভরপুর হয়েছে ভেবে উৎফুল্ল হবার চেষ্টা করলুম।

আশুদা ফিক্ করে হেসে বললেন, বললুম ফেরৎ পাবে। অনর্থক ভিড় দেখে ভিড়তে চাচ্ছিলে না।

অচলগুলো আশুদার হাতে দিয়ে বললুম, আমার দ্বারা হল না আশুদা, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পার।

আশুদা নির্ব্বিবাদে সেগুলো পকেটে পুরে বললেন, আজ আর নয়, ফিরে এসে বাজারটা মাটি করে দিয়েছো। আর একটা কিউ হীন ভিড়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এতগুলো অচল এনেছো পকেটে করে, অথচ সেটা আমাকে আগে জানাওনি। এখন যে অচল মার্কা হয়ে পড়েছ।

আশ্চর্য হলুম এ কথায়। ক্রোধে প্রায় বাক্‌রুদ্ধ অবস্থায় বললুম, তুমিও বলছ এ কথা। দশ টাকার নোট ছাড়া আমার কাছে আর এক পয়সা ছিল না, এতো তোমার জানা কথা।

আশুদা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। চোখে তার এক অদ্ভুত সন্দেহ-পূর্ণ দৃষ্টি। নাসিকা একটু কুঞ্চন করে বললেন, ডুবে জল খাওয়া একদশীতেও চলে।

কঠোর বিরক্তির সঙ্গে বললুম, ওসব অভ্যাস তোমারই একচেটিয়া

আশুদা। আমার কোষ্ঠিতে ও সব লেখে না। অচল জিনিষ ছুঁড়ে ফেলে দিতেই অভ্যস্ত আমি, অন্যের ঘাড়ে চাপানো আমার দ্বারা কোনদিন হয় না। আমার উপর অযথা দোষারোপ করা ঘোর অন্যায়।

বাধা দিয়ে উত্তেজনার সঙ্গে আশুদা বললেন, পাঁচসিকের মাছ কিনলে পাঁচ টাকায়। অচল দিয়ে পড়ল আটটাকা। এই সব টাকা জোগাতে গিয়ে তার মধ্যে দু'চারটে যদি অচল গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে দোষটা কিসে বলতো? এগুলো তো আর তৈরী করিনে। যেমন ভাবে অজ্ঞাত সারে পকেটে আসে, তেমনি জ্ঞাতসারে একটা বেরোবার পথও খোলা চাই। আমরা ঠকি, তাই ঠকাই।

নাসিকা কুঞ্চিত করে বললুম, তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি দিই দাদা, শুধু অনুরোধ আয়নাতে নিজের রূপ দেখে অন্যকে যেন ভুল করে বসো না।

আশুদা হেসে বললেন, তবে ঠক্‌তে হবে। চারিদিকেই ঠকাঠকির কারবার চলছে। আয়নাটা চারিদিকে একবার ঘুরিয়ে নিলেই দেখ্‌তে পাবে ঠকাঠকির জয় জয়কার। প্রকার ভেদ অবশ্য অনন্ত। এর কতক-গুলোর বাইরেটা আবার বেশ রং চং করা। তথাকথিত সভ্যতার ছাপ। সাধুতার দাম নেই আজকাল।

বাজারের কলরোলের পরিবেশে আশুদার এই মূল্যবান উপদেশ রুচিকর মনে হচ্ছিল না। নিজের অক্ষমতার পরিচয় অহর্নিশই পেয়ে আসছি। অন্যের মুখে তার প্রকাশ রুচিকর নয়।

ছিন্ন চাদরটা গায়ে জড়িয়ে মাছসুদ্ধ পাঞ্জাবীটা তুলে ধরে বললুম্, এখন চলি আশুদা।

আশুদা ব্যাগটা খুলে মাছ আছে জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে সান্ত্বনার স্বরে বললেন, মাছের দামটা তোমার বড় বেশী পড়ে গেল। আমারটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলুম, হুবহু এক মাপের। মাথা থেকে ল্যাজা পর্য্যন্ত মিলে

গেল। অথচ দামের তফাৎ কতো। দেখে শুনে দর কষে নিতে হয় ভায়া। নইলে এমনি পস্তাতে হয়।

সদুপদেশগুলি কর্ণে মধু বর্ষণ করছিল না। রূঢ় প্রত্যুত্তরগুলো জিভের আশে পাশে এসে ভিড় পাকাতে লাগল। চোখ মুখটাতেও প্রবল একটা বিরক্তিভাব সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

আশুদা কি যেন পরিহাস করতে চাচ্ছিলেন। সহসা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা তুমি এগোও। আমার কিছু তরকারী কেনা দরকার।

বুঝলুম্ অচলগুলো চালাবার শেষ একটা চেষ্টা না করে আশুদা সহজে নড়ছেন না। আর একটা কিউহীন ভিড়ের সন্ধান করে তিনি বেড়াতে চান। আশুদার এটা যেন চিরন্তন অভ্যাস। অচল নিতেও তাঁর বাধে না, যেন তেন প্রকারেণ সেটা চালাতেও তিনি কসুর করেন না। দ্বিধা কুণ্ঠা কোনটাতেই নেই।

আমি আপন মনে চল্‌তে লাগলুম্। আশুদা প্রায় চীৎকার করে সবাইকে জানিয়ে বললেন, একটা রিক্সা করেই বাড়ী ফিরো, যা চেহারা হয়েছে তোমার। হেঁটে গেলে ফাঁড়িতে চালান দেবে।

উক্তিটা কঠোর সন্দেহ নেই। তবু হাসি পেল তাঁর কথায়। ইচ্ছা হল, এই অবস্থাতেই কোন স্টুডিয়োতে ঢুকে মাছসুদ্ধ একটা ফটো তুলতে পার্‌লে ভবিষ্যতের স্মারক হয়ে রইবে। ইচ্ছা দমন করেই বাড়ী ফিরলুম্। রিক্সাওয়ালাটাকে বিদায় দিয়ে সজোরে দরজার কড়া নাড়তে আরম্ভ করলুম। অদ্ভুত এই বিজয় অভিযান সাড়ম্বরেই ঘোষণা করব অন্দর মহলে। দরজার কড়াটায় প্রচুর শব্দোৎপাদন করা তারই প্রারম্ভিক প্রকাশ মাত্র।

গৃহিণীর চুড়ির নিক্কন শোনা গেল। দ্রুতপদ বিক্ষেপে তিনি এসে দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে আমাকে দেখেই, আমার নাকের ডগাতেই সহসা

দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন। তারপর তারস্বরে ঝিকে ডাকতে লাগলেন। প্রাচীর ডিঙিয়ে তাঁর কর্কশ ভীতিবিহ্বল স্বর ভেসে এল।

জড়িতকণ্ঠে তিনি ঝিকে কি বললেন, তা ঠিক বোঝা গেল না। ঝি অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, মাগো, এ যে বাবু! এমন দশা করলে কে গো!

দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সশব্দে মাছটা গৃহিণীর সামনে ফেলে দিয়ে উত্তেজনার স্বরেই বললুম, নাও তোমার মাছ! যা ঝকমারী! অসময়ে যত আব্দার! কি ঝক্কিই যে পোয়াতে হয়েছে!

গৃহিণী চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন, তোমার জামা কাপড় চাদরের এ দশা কেন? সবগুলোই যে কুটো কুটো করে ছিঁড়ে ফেলেছো। চোখ দুটোও দেখছি জবাফুলের মত লাল। এ তোমার হল কিগো?

রাগটা যেন চোখ দুটোর উপরই ক্রমশ চেপে বসেছিল। আকৃতিতে সে দুটোকে একটু বড় করেই বললুম, কি বলতে চাও তুমি? এর মানে কি? এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে—

গৃহিণী আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিলেন। সহসা বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, নেশা ভাঙ করে এসেছো না কিগো? এ অভ্যাস তো ছিল না কোন দিন। এ আবার কি সর্বনেশে রোগে ধরল। তাই তো বলি, মাছ কিনতে গেছে সেই কোন সকালে, দুপুর রাতেও তার পাত্তা নেই। এত সময় তো মাছ কিনতে লাগে না। তাড়িখানায় ঢুকে বেলেল্লাপনা করে এলে। বাহাত্তুরে—

ক্ষোভে কণ্ঠ জড়িত হয়ে এল। বিকৃত সুরে বললুম, এত কষ্ট করে মাছটা কিনে আনলুম, আর তুমি—তু—তু—

ক্রোধে মুখ দিয়ে কথা আর বের হল না।

গৃহিণী আনুনাসিক কণ্ঠে বলে উঠলেন, কথা বেরুচ্ছে না মুখ থেকে। নেশায় বুঁদ হয়ে এসেছে রে। মানুষ নয় তো আস্ত জানোয়ার।

প্রতিবাদে কঠোর সুরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলুম কিন্তু সেটা আর গন্তব্যপর হল না। মনীষা দেবী বেরিয়ে এল পাশের ঘর থেকে। সুরটা তাই—খাদে নামিয়ে তরল সুরে পরিহাস করে বললুম, এসো শ্যালিকা সুন্দরী। তব পুণ্য পরশে—

বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মনীষা বলে উঠল, ছি! ছি জামাইবাবু! এ কি করলেন আপনি? আপনাকে একটা আদর্শ চরিত্র বলে এতকাল ধারণা করে এসেছি। আজ তার উল্টো পরিচয় পেলুম। নেশায় মত্ত এমন অমানুষ হবেন, এ যে আমার স্বপ্নেরও অতীত।

কথা বলার শক্তিই যেন আমার লোপ পেয়ে গেল। অবাক হয়ে এদের অদ্ভুত উক্তির কথাই ভাবতে লাগলুম। কল্পনার গতির বহর দেখে হাসিও পেল।

গৃহিণী মাছটা পরীক্ষা করছিলেন। সহসা সেটা মনীষার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললেন, ছাখ মনীষা একটা আস্ত পচা মাছ এনেছে কিনে। নরক কুণ্ড আর কি? আরে, নেশায় বুঁদ হলে ভাল মাছ কেনার বুদ্ধি থাকে কখনো?

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, পচা মাছ! সে কি?

মাছটা তুলে নিয়ে সজোরে আমার পায়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে ক্রোধের সঙ্গে তিনি বললেন, নাঃ কবেকার টাটকা মাছ! বসে বসে কাঁচা অবস্থাতেই চিবুতে আরম্ভ কর। নেশায় জমবে ভাল।

মাছটা পরীক্ষা করবার জন্য ঝুঁকে পড়লুম।

মনীষার হাত ধরে বললেন তিনি, চল, আজ তোর বাসাতেই রাতটা কাটাব, সারারাত ধরে মাতলামো করবে সেটা আমার সহ্য হবে না।

কোন কথা বলবার ফুরসুৎ পেলুম না আমি। গৃহিণীসহ মনীষা বের হয়ে গেলেন। যাবার সময় আমার দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না।

পচা মাছটা নিয়ে আশুদার সন্ধানে বের হলুম। তারই সঙ্গে নিশ্চয় বদল হয়েছে এটা।

বাসায় সন্ধান পেলুম না তার। সব দরজা জানালা বন্ধ করে আশুদা যে কোথায় বের হয়ে গেছেন, তার সন্ধান কেউ বল্‌তে পারলেন না।

অগত্যা গঙ্গার মাছটা গঙ্গাতেই বিসর্জ্জন দিয়ে শীতের হিমেলী ঠাণ্ডায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। বিকাল বেলায় এক কাপ চা পর্য্যন্ত পেটে যায় নি। ভাবলুম, নৈশ আহারের ব্যাবস্থাটা যখন বাড়ীতে হবার কোন সম্ভাবনা নেই, তখন একটা হোটেলেই সেরে নেওয়া ভাল। কিন্তু উঠি উঠি করেও উঠতে পারলুম না। সন্ধ্যা থেকে যে অঘটন ধারাক্রমে ঘটে গেল, সংসার জীবনে এ অভিজ্ঞতার মুল্য কতটুকু, তা যাচাই করে নেবার মনের অবস্থা আমার নয়। মনটা এমনি ভার হয়ে রইল যে খাবার কথাটা বার বার উঁকি দিলেও তার প্রচেষ্টাটুকুও করতে পারলুম না। রাতটা যেন অভুক্ত অবস্থাতেই কাটানো বাঞ্ছনীয় মনে হল। বিবক্ত মন নিয়ে হোটেলের খাবারে রুচি হচ্ছিল না। অনেকটা রাত করেই বাড়ী ফিরলুম।

অবাক হয়ে দেখি গৃহিণী অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করে আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, সারারাতটা টো টো করে সহরে ঘুরে বেড়ালেই হতো। তোমার আশুদা তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে এইমাত্র খেয়ে গেলেন। তোমার জন্য আমার ও মনীষার পর্য্যন্ত খাওয়া হয়নি এখনো। এত দেরী করলে? এতটুকুও আক্কেল নেই তোমার।

ধুলো পায়েই বসবার উপক্রম করছিলুম। গৃহিণী কণ্ঠস্বরে মাত্রা চড়িয়ে বললেন, হাত পাটা ধুয়ে বস্‌লে কি মানটা খসে পড়বে? যা নোংরা অভ্যাস এতটুকুও জ্ঞান গম্যি নেই।

ক্ষোভের সঙ্গে জানালুম, নেশা করলে জ্ঞান গম্যি থাকে নাকি?

ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললেন তিনি, তা ছাড়া আর কি? নইলে আট টাকার

কেনো ইলিশ মাছ। জামা কাপড়ও আস্ত রাখনি। তুমিই সংসারটা ডোবাবে দেখছি।

নির্ব্বাক হয়ে গৃহিণীর ছুর্জ্ঞেয় চরিত্রের সন্ধান করতে লাগলুম। পরিস্থিতিটা সরল করার মূলে যে আশুদা সেটা বুঝতে পারলুম।

ঈষৎ হেসে বললেন তিনি, নাও আর দেরী করো না। যা কষ্ট গেছে আজ তোমার। আমারই অন্যায় হয়েছে। এখন খেতে বসো—তোমার শ্যালিকা সুন্দরীই মাছটা রেঁধেছে আজ।

সুরটায় প্রীতিরস যেন ঝরে পড়ল। হাত পা মোছার জন্য তোয়ালেটা এগিয়ে দিলেন তিনি।

আশ্চর্য্য এই গৃহিণী। পাঞ্জাবী আর চাদরটার কথা ভুলে গিয়ে উৎফুল্ল হয়ে সিঁড়িটার উপর গিয়ে বস্‌লুম।

অর্থম্

অর্থের প্রয়োজনটা বিশেষভাবে অনুভব করছিলুম। সবাই এটা করে থাকে বটে, আমার প্রয়োজনের তাগিদ বেশী। গৃহিণীর আতিশয্যে খরচের টাকা থেকে লটারীর টিকিট কিনে ফেললুম কয়েকটা। বাস, বীজ বপণ হয়ে গেল। ফসলের আকাঙ্ক্ষায় মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

গৃহিণী নানা রকম তুকতাক্ আরম্ভ করলেন। এর যে কোন একটাকে বাগ মানাবেনই। অফিসে ফাইল নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে বারবার মনে হচ্ছিল, গৃহিণী যা ব্যবস্থা নিচ্ছেন, তাতে নিদেন একটা রুই কাতলা তো উঠবে। উল্লাসের মনোভাব নিয়ে অফিস থেকে ফিরলুম।

বাড়ীতে অগুণতি লোক। ঘরে আর ঢোকা যায়না। গণৎকারের সভা বসেছে সেখানে। শুনলাম সারা দুপুরটাই নাকি গণৎকারের আনাগোনায় গম্‌গম্ করছে। এখনো তার বিরতি ঘটেনি।

ছোট মেয়েটিকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানলুম, এটা নাকি সপ্তম পর্য্যায়ের অভিযান। এর আগে আরও ছয়টা গণৎকারের এসে টাকা প্রাপ্তির নির্ঘাৎ সম্ভাবনার কথা জানিয়ে গেছে। গৃহিণী এই নিয়েই মসগুল। ছেলে মেয়ে মায় গৃহিণীর হাতে অর্থ প্রাপ্তির যোগ আছে। মায় কোষ্ঠী বিচার পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। গৃহিণীর স্নানাহার পর্য্যন্ত হয়নি। আনন্দের আতিশয্যে ও দুটোর কথা বেমালুম ভুলে গেছেন।

মাইনে সবেমাত্র কাল পেয়ে গৃহিণীর হাতে তুলে দিয়েছি। বুঝলুম্ এটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহিণী ছাড়ছেন না।

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। গৃহিণী সহাস্যে জানালেন, কোন চিন্তা নেই। স্ত্রীভাগ্যে ধন লেখা আছে তোমার। টাকা এসে যাবে নির্ঘাৎ। সবাই বলছে একথা। বৃহস্পতি নাকি তুঙ্গে উঠেছে।

দেবগুরু বৃহস্পতি তুঙ্গেই উঠুন অথবা ভঙ্গ হয়েই পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ুন, সেটা আমার এখন ভাববার কথা নয়। কিন্তু যে পর্য্যায়ে খরচ চলছে তাতে ভাঁড়ে মা ভবানী এসে পড়েছেন। সামনে এখনো উনত্রিশ দিন বাকী। এতগুলো দিনতো আর বায়ু ভুক হয়ে থাকা যাবেনা। তবু শুক হেসে বললুম্, এতগুলো জ্যোতিষীর বলাতো আর মিথ্যে হবার নয়। কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

গৃহিণী সায় দিয়ে বললেন, সত্যিই তো, তবে তোমার সব উড়িয়ে দেওয়া অভ্যাস। ডেকে পাঠিয়েছি, আরও কজন বড় গণৎকার। এঁরা কপাল দেখেই বলে দিতে পারেন।

কোন উত্তর দিলুম না এ কথায়। নীরবে ঘর থেকে বের হয়ে এলুম। কি কুক্ষণেই যে লটারীর টিকিট কিনেছিলুম, আর সেটা যে এমনি ভাবে

দেখা দেবে এটা ভাবতেও পারিনি। রাতেও ঘুমাবার সম্ভাবনা নেই। লাঠিটা নিয়ে আবার বৈকালিক ভ্রমণে বের হলুম। চা আর জলখাবারের মায়া ত্যাগ করতে হল।

একটু বেশী রাত করেই বাড়ী ফিরলুম। বাড়ীতে তখন যজ্ঞের তুমুল কাণ্ড চলছে। সারা বাড়ীটাই ধোঁয়ায় অন্ধকার। দম আট্‌কে যাবার উপক্রম। ধোঁয়ার কুহেলী ভেদ করে দেখতে পেলুম, পট্টবস্ত্র পরিহিতা গৃহিণী দেড়ইঞ্চি পরিমাণ সিন্দুরের ফোঁটা লাগিয়ে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে প্রবলবেগে ঘৃতাহুতি দিয়ে চলেছেন।

বার টাকার কমে আর যজ্ঞের ঘি এ বাজারে মেলেনা। যজ্ঞের যা বহর দেখছি, দুই তিন সেরে কুলাবে কিনা সন্দেহ।

ছোট ছেলেটি বড় প্রাক্‌টিক্যাল। লেপের তলা থেকে মুখ বের করে বলে উঠল, চারটি মুড়ি বের করে খেয়ে শুয়ে পড়ো। রাতে আজ রান্না হয়নি। আমরা সব জলভাত খেয়েছি।

একটা অসহায়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাইস হোটেলের সন্ধানে বের হলুম। এত রাতে আবার খাবার মিললে হয়। গৃহিণীর ঘৃতাহুতির মাত্রা তখন অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছে।

পরদিন অফিস যাবার পথে মানসবাবু ব্যঙ্গ করে বললেন, কি ভায়া তোমার বাড়ীতে যে শ্রাদ্ধের কাণ্ড চল্‌ছে। গৃহিণী দুবার ফিরে এসে হেসেই আকুল। মানে অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে—

শ্রাদ্ধই বটে! তবে ভূতের বাপের। ক্রোধ আর দুঃখ দুটোই এসে পড়ল। কাল রাতে পেটে অন্ন পড়েনি। আজ সকালে নিজেই দুটো ফুটিয়ে নিয়ে কোন রকমে গলাধঃকরণ করে অফিস চলেছি। তবু কোন মতে সাম্‌লে নিয়ে পরিহাসের সুরে বললুম, দাদা, এবার লক্ষপতি না হয়ে আর ছাড়ছিনে। লটারী কোনটাই যাতে ফস্কে না যায় তারই বশীকরণ চলছে।

নাকটা তীর্যক ভাবে রেখে বললেন তিনি, বটে! তাইতেই তো এত সমারোহ। ভায়া হে. ত্রিশ বছর ধরে জানা অজানা সব কটারই টিকিট কিনে আসছি ফি বছর। বিরাট একটা অষ্টরম্ভা ছাড়া আর কিছু জোটেনি এতকাল। তোমার ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে।

মনটায় একটা হতাশার ভাব দেখা দিল। ভস্মে ঘি ঢালাতো যথেষ্টই চলছে। নিজের আর্থিক জীবনে যেটা যখন সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়, তখন শূন্য পকেটের রিক্ততা তিক্ততারই সৃষ্টি করে। গৃহিণী আশাবাদী, তার সান্ত্বনার সুর সুদূর প্রসারী। কানে আরো জল না দিলে নাকি, কানে ঢোকা জল বেরিয়ে আসে না। টাকা খরচ না করে উপায় নেই। ওটা খরচের জন্যেই সৃষ্টি। তবে আমার যে পর্য্যায় চলছে, তাতো আর ক্ষীণ ঝরনা নয়, বর্ষার প্রবল বন্যা।

বিকালে বাসায় ফিরে দেখলুম গনৎকারের দল সব বিদায় নিয়েছে। চারিদিকে যজ্ঞের ছাই-এর ছড়াছড়ি। বুঝলুম্ মাইনের টাকা সব উড়ে গেছে। তবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম্। ঘুমে চোখ ঢুলে পড়ছে। কাল সারা রাত ঘুম হয়নি। পেটের জ্বালা আর যাজ্ঞিকদের অশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের তাণ্ডব নিনাদে ঘুমের নেশাও দেখা যায় নি।

ছেলেমেয়েরা হয়েছে এক একটা সন্ন্যাসীর পকেট সংস্করণ। সারা গায়ে কপালে ছাই মাখা। এসব গৃহিণী কিম্বা যাজ্ঞিকরা সৃষ্টি করেছে তা ঠিক বোঝা গেল না। এখন গৃহিণীর হাতে সাবান খরচের পয়সাটা থাকলে হয়।

চুপ করে রইলুম। মাঝে মাঝে গির্জ্জায় গিয়ে বাইবেল শুনে আসতুম। এজন্য গৃহিণী নাস্তিকতার অপবাদ দিয়ে এসেছিলেন। এখন কোন কথা বলা নাস্তিকতারই নিদর্শন হবে ভেবে উচ্চবাচ্য না করাই সমীচীন বোধ করলুম।

গৃহিণী দেখা দিলেন। হাতের চুড়িগুলো অদ্ভুত শব্দ করে উঠল। শব্দটা অবশ্য ধাতব নয়। সোনার চুড়িগুলো অদৃশ্য হয়েছে সেখান থেকে। অনেকগুলি কাঁচের চুড়ি শোভা পাচ্ছে সেখানে। চুড়িগুলির এক একটি

গুজনও এক ভরির কম ছিলনা। এ বিবাহের দান! স্ত্রীধন কাজেই আমার বলার কিছু ছিল না। তবু ক্ষোভের সঙ্গে জানালুম, সবগুলো চুড়িই বুঝি গণৎকারেরা না নিয়ে উঠলনা।

শুষ্ক একটা হাসি হেসে বললেন তিনি, লটারীর টাকা পেলে এর চার গুণ তৈরী করে দিয়ো। দৈবকার্য্যে অনেক করতে হচ্ছে। যা মাইনে পাও তাতে কি এসব কাজের খরচ কুলায়?

মনটা দমে গেল। বুঝলুম, এ মাসের মাইনেটার কি গতি হয়েছে। এ মাসটা আবার একত্রিশ দিনের। সামনের আটাশটা দিন চোখের সামনে ভেসে উঠল। অদৃশ্য চুড়িগুলোও চোখের সামনে এসে নেচে নেচে বুড়াঙ্গুষ্ঠ দেখানো আরম্ভ করল। হতাশ হয়ে বিছানাটার উপরেই বসে পড়লুম।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, এখন বসে থাকলে চলবে না। চা খেয়ে খোঁজ নিয়ে এসো, গাড়ী ছাড়ছে কখন? আজ রাতেই যেতে হবে শিবতলায়। সেখানে এক বড় সন্ন্যাসী এসেছে। যা বলে দেয়, নির্ঘাৎ ফলে যায়। কালই সে আবার চলে যাবে কামরূপ কামাখ্যায়।

অনেক খরচের পথ সেটা। রিক্সা রেল, গরুর গাড়ী এ ত্রিবিধযানে সেখানে যেতে হবে। ভাড়া বাবদ লাগবে অনেক টাকা। কি দিয়ে খরচ মেটানো যাবে। মাইনের টাকাগুলোও সব উবে গেছে।

অসহায় দৃষ্টিটা গৃহিণীর গলদেশে পড়ল। সেখানে একটা মূল্যবান হার থাকত বলে জানা ছিল। কিন্তু ব্লাউজ আর শাড়ীর অন্তরালে গলদেশ আবৃত থাকায় সেটা আছে কি না বোঝা গেল না। গৃহিণী যখন ঝোঁক ধরেছেন, তখন সেটা আর না করে ছাড়বেন না।

তিনিই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। আমার উপর একটা স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গম্ভীর হয়ে জানালেন, তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে শ তিনেক

টাকা এখনি ধার করে নিয়ে এসো। এর এক পয়সা কমে কুলাবে না। শিবতলাতেও একটা পুজা দিতে হবে ভাল করে।

দেবাদিদেব মহাদেব। কৈলাস শিখরে তিনি ভূত-প্রেত নিয়েই ব্যস্ত আছেন। তাঁকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি। নিজের গৃহিণীকে টুক্রো টুক্রো করে কেটে ফেলবার ব্যবস্থা করে তিনি এখন দিব্য শ্মশানে বিরাজ করছেন। হঠাৎ অসময়ে আমার এই লটারী লোভী গৃহিণীর স্কন্ধে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করলেন কেন জানিনা। বর্ত্তমান অবস্থায় অলঙ্কারহীন গৃহিণী আর বেতনহীন স্বামী এই ধাক্কা কি করে সামলাবেন, তা একবার ভেবেও দেখ্লেন না। পুজোটা লটারী প্রাপ্তি পর্য্যন্ত মুলতবী রাখ্লে এমন কি ক্ষতি ছিল?

গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে বললেন, ভাবছ কি বসে বসে। চট্‌পট উঠে টাকাটা নিয়ে এসো। শিবতলার পুজো তো আর সহজ নয়।

গৃহিণীর কথায় সায় দেওয়াই অভ্যাস। এর জন্য খেসারতেরও অন্ত নেই। তবু সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। তাই বললুম, বড় জাগ্রত দেবতা শুনেছি। কিন্তু আমাদের উপর কৃপা করা তাঁর—

বাধা দিয়ে বললেন তিনি, তুমি যেমন খৃষ্টান, দেবতার কৃপা তোমার উপর কি করে হবে? স্ত্রী ভাগ্যে ধন লেখা আছে তোমার, তাই যদি লটারীর টাকাটা জুটে যায়।

চুপ করে রইলুম। স্ত্রী ভাগ্যে ধন কবে এসে বাক্সে জমা হবে জানিনে। এতকাল সেটা বাক্স থেকে অবিরাম গতিতেই বের হয়ে যেতে দেখেছি। বর্ত্তমান যন্ত্র যুগে সেটা আবার রকেটের গতিবেগ লাভ করেছে। পুরুষ না কি নিষ্ক্রিয়। সংসার খরচের বহরে সেটা ভাল ভাবেই টের পাচ্ছি। প্রকৃতি ঘোরতরা সক্রিয়া হয়ে উঠেছেন এ বিষয়ে।

বললেন তিনি, নাও আর কুঁড়ের মতো বসে থেকোনা। টাকাটা এখনি

নিয়ে এসো। ভারী তো তিনশ টাকা। যার কাছে চাইবে, সেই দিয়ে দেবে এখন।

ভাবলুম গৃহিণীর দৃষ্টি এখন কেবল লটারীর প্রথম পুরস্কারের দিকেই নিবদ্ধ রয়েছে। লাখ টাকাগুলো চোখের সাম্‌নে ভাসছে। নইলে তিন শ টাকাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছেন না। চিন্তিত হয়ে বললুম, অতগুলো টাকা সহসা পাওয়া মুস্কিল। সবার অবস্থাই তো আমার মতন।

গৃহিণী বিরক্তির সঙ্গে বললেন, যত সব বাউণ্ডুলে বন্ধু তোমার। তিন শ টাকা দেবার মত মুরোদ নেই কারও। এক জনের কাছে না পাও নিয়ে আস যত জনের কাছ থেকে পার। পূজো দিতেই হবে। মানত করে ফাঁকি দিলে চলবে না।

ধনী বন্ধুদের কথা মনে পড়ল। কার্ড দিয়ে পর্য্যন্ত দেখা পাওয়া যায় না তাদের। কেমন যেন একটা নাক সিটকানো ভাব। সংস্পর্শ তাদের সঙ্গে প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। বন্ধুত্ব এখন স্বশ্রেণী এবং সমপরিমাণ আয়ের বন্ধুদের মধ্যেই নীড় বেঁধেছে। টাকা পয়সার অভাব আমার চেয়ে তাদের কারও কম নয়। বললুম, টাকা কোথাও পাওয়া যাবে না। একটা সিগারেট পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না তাদের কাছে।

গৃহিণী ঠাট্টা করে বললেন, সব বিড়িখোর বন্ধু বুঝি?

গম্ভীর হয়ে জবাব দিলুম, না, তারাও আবার আমাব মতই লটারীর টিকিট কিনেছে কিনা, তাই।

গৃহিণী মুখ কালো করে বললেন, তাই তো। অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চিন্তা করার পর এটা ওটা নাড়াচাড়া করে শেষটায় উঠে চলে গেলেন। ভাবলুম, শিবতলার ভুতটা বোধ হয় ঘাড় থেকে নামল।

সেদিন আর খাওয়া হল না। সারারাত না ঘুমিয়ে পায়চারী করে বেড়াতে লাগলেন তিনি। ঘুমের ফাঁকে ফাকে তাঁর অস্থিরতার সঙ্গে পাদ চালনা দেখে মনে মনে স্থির করলুম, টাকাটার যোগাড় যেমন করেই হোক করতে হবে।

শেষরাতে তাঁকে বাড়ী বন্ধক রেখে টাকা যোগানোর ভরসা দিয়ে ঘুমের ব্যবস্থা করতে হল।

বাড়ীটা আর বাঁধা দিতে হল না। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে টাকাটা ধার করে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে পরের দিন বেরিয়ে পড়লুম, শিবতলার সন্ধানে। বন্ধুরাও এই অভিযানে সমবায় পদ্ধতিতে ত্রিশ টাকা ঋণ আর অজস্র উপদেশ বর্ষণ করেছিলেন।

গৃহিণী পথে বার বার জানালেন, সন্ন্যাসীটার আবার দেখা পেলে হয়, আজই তার চলে যাবার কথা।

দেখাটা না হওয়াই আমার পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ এ কথাটা চেপে রেখে উৎসাহ দিয়ে বললুম, নিশ্চয়ই দেখা পাওয়া যাবে।

অনেক তক্‌লিফ ও খরচের পর শিবতলায় পৌঁছে দেখ্‌লুম স্থূলদেহী সন্ন্যাসীটি বহাল তবিয়তে আছেন। পরোক্ষে সংবাদ নিয়ে জানলুম, সহসা এর নড়ন চড়নের সম্ভাবনা নেই।

স্থূলবপু সন্ন্যাসীটার বিপুল ভোজনের বহর দেখে এঁকে কোন পর্যায়ে ফেলব, তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। গৃহিণী তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, ভক্তি করো। আমি একটু হেসে সরে এলুম।

সন্ন্যাসীর চেলার সংখ্যাও কম নয়। সাত আটটি হবে। প্রত্যেকটির ষণ্ডামার্কা চেহারা এবং ভোজনেও গুরুর চেয়ে কম নয়।

শিবলিঙ্গ দেখা গেলনা। লটারীর টাকা দেবার ভয়ে বোধ হয় বেলপাতার তলে আত্মগোপন করেছেন।

গৃহিণী সভয়ে সন্ন্যাসীর কাছে প্রার্থনার কথা জানালেন। সন্ন্যাসী মুচকি হেসে গম্ভীরতার ভান করে আধা হিন্দী আধা বাংলায় বলল, কুছ পরোয়া নাই, হামি সব ঠিক করিয়ে দেবে। লেকেন টাকা লাগ্‌বে পাঁচশ। বহুত যজ্ঞ হোবে কি না।

সংসার চরিতম্

গৃহিণীর অনেক কাকুতি করে তিনশ টাকা ধরে দিলেন তার কাছে। শিব পুজো যে কি দিয়ে হবে, তা ভেবেও দেখ্‌লেন না। সন্ন্যাসী হাঁ, না কিছুই বললেন না। একজন শিষ্য এসে ছোঁ মেরে টাকাটা তুলে নিয়ে গেল।

গৃহিণী উঠে এসে একান্তে জানালেন, আফিসে সাহেবদের কাছে দিনে একশবার মাথা নোয়াও, এমন সন্ন্যাসী দেখেও ভক্তি করলে না। লজ্জাও নেই তোমার মত খৃষ্টানদের।

কথাটা অবশ্য আংশিক সত্য। চাকুরিতে ঢুকে কারণে অকারণে আফিসের সাহেবদের কাছে মাথা নোয়াতে হয়, কথার তৈলমর্দ্দনেও প্রচুর উৎসাহ দেখাতে হয়। এ অবস্থায় এমনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি যে পোষাকের দোকানের কাঠের ফ্রেমে সাহেবী পোষাকে সাজা নকল মূর্ত্তিকা দেখেও যেন অজ্ঞাতসারে মাথাটা নুইয়ে পড়ে। সে সাহেবরা ভাল কি মন্দ সে বিচারের ক্ষমতাও নেই।

গৃহিণী গম্ভীর হয়ে বললেন, দেবস্থানে এসেছ; খৃষ্টানী আচারটা ছাড়। লটারীর টাকাটা পেলে তোমারই লাভ হবে।

মনে মনে হাসলুম। লটারীর টিকিটগুলো গৃহিণীর নামেই কেনা। যদি মিলে যায়, খরচের বন্যার মুখে তৃণখণ্ডের মত ভেসে যাবে।

আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হল একটা ভাঙ্গা ঘরে। যজ্ঞের বিভিন্ন প্রক্রিয়া চল্‌তে লাগল। গৃহিণীকে উপবাসী হয়ে থাক্‌তে হল দুদিন। তৃতীয় দিনে শুধু ফল দেওয়া হল। চতুর্থ দিনে উপবাসী থেকে পূর্ণাহুতি দেবার ব্যবস্থা হল। আমার প্রবল আপত্তি স্বত্বেও গৃহিণী একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সে সব মেনে চলতে লাগলেন। লটারীর টাকা পাবার জন্য শিবের দুয়ারে টাকার শ্রাদ্ধ চলতে লাগল। নগদ তিনশো তো গেছেই। আমার কাছে যা ছিল, সেটাও নিঃশেষ হতে চলেছে। এখন ফিরে যাবার ভাড়াটা থাকলে হয়।

বৃকোদর সন্ন্যাসীটি জানিয়েছেন, আমাদের প্রত্যেকটি ক্রিয়াই নাকি সার্থক হয়েছে। মন্ত্রোচ্চারণও কম হয় নাই। এর কোনটারই কোন অর্থ নেই। বেশীর ভাগই হচ্ছে বর্ণমালার অক্ষরগুলোর সঙ্গে অনুস্বার জুড়ে দেওয়া।

চতুর্থ দিন রাতেই আমাদের রওনা হতে হবে। পূর্ণাহুতি দিয়েই রওনা হবো স্থির হয়েছে। পরের দিন আমাকে আফিসে যেতে হবে। গাড়ী ঠিক করা হয়েছে। গৃহিণী আপত্তি করেননি। যাই হোক্, চাকুরীটুকুর কদর তিনি বোঝেন।

সন্ধ্যায় উপবাস ক্লিষ্ট দেহেই গৃহিণী স্নানটা করে ফেললেন। তারপর পট্ট বস্ত্র পরিধান করে আমার সাম্‌নে এসে টিপ করে একটা ভক্তি জানালেন।

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখলুম, গলার হারটি জল্ জল্ করছে। ওটা গনৎকারদের পেটে যায়নি জেনে পুলকিত হয়ে উঠলুম। একটা হারের দামই হাজার টাকার উপর।

বললুম, একি ব্যাপার।

উত্তর দিলেন তিনি, সন্ন্যাসী ঠাকুর বলেছেন, অলঙ্কার পরে আহুতি দিতে হবে। সব গেছে, আছে কেবল এই হারটুকু আর সোনা বাঁধানো শাঁখা। তাই পরলুম্।

উৎসাহ দিয়ে বললুম্ বেশ করেছো, সুন্দর মানিয়েছে তোমায়। গৃহিণী আরক্তিম হয়ে বললেন, কি যে বলো? এখন কি গয়না পরবার বয়স আছে ?

গম্ভীর হয়ে বললুম, তা বলে ওটা আবার সন্ন্যাসীঠাকুরের কাছে বিলিয়ে দিয়ো না।

গৃহিণী হাসলেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আজ সন্ধ্যার পরে

পূর্ণাহুতি দেবার কথা। ঐ সময় আর কেউ থাকবে না। তোমার পর্য্যন্ত থাওয়া নিষেধ।

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, সেকি? সস্ত্রীক ধর্ম্মমাচরেৎ এতো শাস্ত্রেই লেখা আছে। তোমার বেলা ব্যতিক্রম ঘটকে কেমন করে? সস্ত্রীর পরিবর্ত্তে সস্বামীই গেলে কি ক্ষতি হবে?

গৃহিণী বাধা দিয়ে বল্লেন, তোমার আচারের ঠিক নেই। ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়েছ তুমি, দেব-দেবীর কি বুঝবে?

চুপ করে গেলুম এ কথায়। শুনেছি তেত্রিশ কোটী দেবতা স্বর্গে বিরাজ করছেন। সেন্সাস নিলে সংখ্যাটা এখন আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে। আফিসের ক'জন সাহেব আর বাড়ীর গৃহিণীকেই নিরন্তর চেষ্টায় সন্তুষ্ট রাখতে পারিনে। পরস্পর বিরোধী ব্রহ্মাণ্ড বাসী দেবদেবীদের মনস্তুষ্টি সাধন করা আমার সাধ্যাতীত। দেবদেবীর কথা তাই বুঝেও বুঝিনা।

আহুতি দেবার জন্য গৃহিণীর ডাক পড়ল। আমিও আমার কক্ষে প্রবেশ ক লুম। সেখান থেকে ভাঙ্গা দরজা দিয়ে যজ্ঞশালার একাংশ দেখা যায়। খানিক পরে দেখলুম, ভস্মে প্রচণ্ড ঘি ঢালা হচ্ছে। সারা ঘর ধূমে আচ্ছন্ন। সন্ন্যাসী নন ষ্টপ টং বং করে যাচ্ছেন। কোনটারই মানে নেই। বুঝলুম লটারী প্রাপ্তির মন্ত্রগুলোর বোধ হয় কোন মানে থাকে না।

ঘণ্টা খানেক পরে প্রকাণ্ড একটা পাত্রে ঘৃত দিয়ে গৃহিণীর হাতে তুলে সন্ন্যাসী জানালেন, আহুতি দেবার আগে গয়নাগুলো সব খুলে ফেলতে হবে।

গৃহিণী নির্ব্বিবাদে হার ছড়াটা খুলে সন্ন্যাসীটার পায়ের কাছে রেখে দিলেন। সোনার শাঁখাটা খুলতেও সন্ন্যাসী বলেছিলেন, কিন্তু গৃহিণী তাতে রাজী হলেন না।

দূর থেকে দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণলুম। সন্ন্যাসীর কবল থেকে হার ছড়াটা ফিরে পাবার আর কোন উপায়ই নেই। গেল হাজার টাকা সন্ন্যাসীর গহ্বরে।

সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়তে লাগলেন। অনেকক্ষণ ঠং বং করার পর গৃহিণী আহুতি দিলেন। আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সন্ন্যাসী তার উপর কাঠ চাপা দিলেন। ঘরটা আবার ধোঁয়ায় ভরে উঠল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর গৃহিণীকে বোঝালেন, মায়ী, টাকা আনতে হলে টাকা খরচ করতে হয়। সব দেবতাকে দিতে হয়। তবে তে টাকা হোবে।

গৃহিণী তার কথায় সায় দিলেন।

আর এক পাত্র ঘৃত তার হাতে দিয়ে সন্ন্যাসী খানিকক্ষণ মন্ত্র পাঠ করে জানালেন, ঘৃত দেবার সঙ্গে সঙ্গে হারটাও তিনি যজ্ঞকুণ্ডে ফেলে দেবেন। সব দেওতাকে দেওয়া হল। এই তো আহুতি।

গৃহিণী আপত্তি করতে লাগলেন। সন্ন্যাসী সেটা শুনলেন না। ঘৃতের পাত্রটা জোর করে যজ্ঞ কুণ্ডে ফেলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই হারটাও।

গৃহিণী আর্তনাদ সুরে বললেন, এ কি করলেন! ওর যে অনেক দাম।

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে তাকে বোঝাতে লাগলেন। গৃহিণী বিষম বদনে বসে রইলেন, কোন কথার উত্তর দিলেন না।

আমি একটু হাসলুম। ভাঙা দরজাটা সত্যিই একটু উপকার করেছে। হারটা যজ্ঞের বেদীতে পড়েনি। পড়েছে শিষ্যের হাতে। শিষ্যটিও সেটা তুলে নিয়ে গৃহান্তরে গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছে। সেটাও আমার লক্ষ্য এড়ায়নি।

সন্ন্যাসীঠাকুর শিষ্যকে ডেকে নিয়ে গৃহান্তরে গেলেন। উপযুক্ত সাকরেদ বটে। আমিও পা টিপে টিপে গিয়ে গোপন স্থানের সন্ধান পেলুম।

দেখলুম শুধু হারছড়াটা নয়, সেই তিনশ টাকাও রয়েছে তার মধ্যে। সব-গুলো নিয়ে আবার তেমনি ভাবে ফিরে এলুম।

একটু পরে বিমর্ষবদনে গৃহিণী ফিরে এলেন। হারটার কথা বললেন তিনি। সন্ন্যাসী ঠাকুর মৌনী রইলেন। চেলাটা আমাকে শাসাতে লাগল। আমিও খানিকটা চেঁচামেচি করে গৃহিণীর সঙ্গে গরুর গাড়ীতে চেপে বসলুম।

দীর্ঘ পথটা তিনি কোন কথাই বললেন না। বাড়ী ফিরে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জোচ্চরদের পাল্লায় পড়ে সব খোয়ালুম। তোমাকেও সর্ব্বস্বান্ত করলুম।

মাস দুই পরে গৃহিণীই জানালেন, কোন লটারীতেই উঠল না কিছু। শুনলুম তাই।

হেসে বললুম, কোন দিনই উঠবে না। শুধু মাত্র একটা জিনিষ ফিরে পেয়েছি।

আমার তোরঙ্গ থেকে লুকানো হারটা বের করে দিলুম তাঁর হাতে।

তিনি বিস্মিত নয়নে চেয়ে রইলেন।

অনর্থম

একটা হোয়াইট লেগ হর্ন মুরগী পুষতে হয়েছিল। বাড়ীতে তাই নিয়ে অনর্থ ঘটে গেল।

গৃহিণী সটান জবাব দিলেন, ওসব ম্লেচ্ছ পাখী হিন্দু বাড়ীতে পোষা চলবে না।

অথচ জীবটি শ্বেতকায়, নধর মাংসল। সাধারণ জাতীয় মুরগীর মতো হ্যাংলাপানা চেহারা নয়। তাই গৃহিণীকে বিলাতী কবুতর জাতীয় পক্ষী বলে বুঝিয়ে রেখেছিলুম। মুস্কিল বাধল শ্যালকের আবির্ভাবে। তিনি সিক্ত রসনা নিয়ে গৃহিণীকে জীবটির স্বরূপ প্রকাশ করে দিলেন।

নানা রকম যুক্তির অবতারনা করে, পাখীটির জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট আবাস তৈরী করা হল। বাইরের ঘরের একটা কোণে তাকে রাখা হল, তবু গৃহিণীর আপত্তি ঘুচল না। বারবার তিনি জানাতে লাগলেন, আপদটাকে বাড়ী থেকে দূর করে দিতে হবে।

নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে একটা ঔদরিক ব্যবস্থা করবার সঙ্কল্প মনে মনে জাগত বটে, কিন্তু সেটা সম্ভবপর নয় বলেই রসনা সংযত রাখতে হল। জীবটির সঙ্গে চাকুরীটির একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। মেম সাহেবের পালিত জীব এটা। বিলাত থেকে সসাহেব ফিরে এলে বাচ্চাসহ ফেরৎ দিতে হবে। আমাকে শুধু চিনির বলদ করে রাখা হয়েছে মাত্র। বৎসরান্তে আবার একটা প্রমোশনের ব্যবস্থা আছে। বাচ্চার সংখ্যা আর মুরগীটার দৈহিক আয়তনের উপরেই সেটা নির্ভর করছে। মেমসাহেব চটে গেলে সে আশা সুদূর পরাহত।

এত সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি ম্লেচ্ছ পাখীটা নিরুদ্দেশ। খাঁচাটায় তালা দিয়েই অফিসে গেছলুম। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি নাক শিটকিয়ে জবাব দিলেন, আমি জানিনে।

প্রমোশনের মূল সূত্রটি এমনিভাবে ছিঁড়ে ফেলায় মনটা বিরক্তিতে ভরে গেল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলুম, পাখীটা তাহলে নিজেই তালা খুলে পালিয়েছে নয়?

গৃহিণী তেমনি ভাবে বললেন, ওসব পাখীর অসাধ্য কর্ম্ম আর নেই।

বটে! অতি কষ্টে রাগটাকে চেপে বললুম, মেমসাহেব এলে তাই জবাব দিয়ো তুমি।

সংসার চরিত্রম্

গৃহিণী রেগে বললেন, তাই দেব; যতসব অনাছিষ্টি কাণ্ড। জাতধর্ম্ম আর রইল না। পাখীটা কি কম পাজি? ভজার হাতটাও আর আস্ত রাখেনি।

ভজা ওরফে ভজহরি বাড়ীর চাকর। গৃহিণীর কাছে কারণে অকারণে সে পানের খরচ আদায় করে। হঠাৎ সে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া শুরু করে দিয়েছে জন্য ক্রোধটায় যেন ইন্ধন পড়ল। দেরাজ থেকে মাইনের টাকা বের করে ভজার হাতে দিয়ে বললুম, মাইনেটা পুরো মাসেরই দিয়ে দিলুম; পানের বাটুয়া নিয়ে সরে পড়। তোর আর চাকরী করার দরকার নেই এখানে।

ভজা টাকাটা হাতে নিল বটে, কিন্তু সরে পড়ার কোন লক্ষণ দেখাল না। ক্ষতবিক্ষত হাতটা শুধু এগিয়ে দিয়ে দেখাল পাখীটাকে ধরতে গিয়ে তার কি লাঞ্ছনাই হয়েছে।

গৃহিনী খেদের সঙ্গে বললেন, ডাক্তারখানায় নিয়ে যাও ওকে। ম্লেচ্ছপাখী কামড়ে হাঁচড়ে দিয়েছে ওকে। তিনচার আইডিনেও রক্ত বন্ধ হয়নি। ম্লেচ্ছ রোগে ধরেছে নাকি শেষে।

ভজাকে সঙ্গে করে রাস্তায় এসে বললুম, টিঙ্কার আইডিনের কর্ম্ম নয় ভজা, যদি বাঁচতে চাস তাহলে পাখীটা কোথায় ছেড়ে দিয়ে এলি খুলে বল। ঐ পাখীর পালক দিয়ে ঔষধ না লাগালে তোর ঐ কাটা ঘা আর সারবে না। সমস্ত শরীরটাই পচে যাবে।

ভজা মাথা চুলকে বলল, গিন্নীমা বারণ করচি।

একটা তাড়া দিয়ে বললুম, গিন্নীমা তোর এই ঘা সারাতে পারবে না। এ একেবারে লেগ হর্ন। বুঝলি, শক্ত ঘা হয়ে যাবে তোর। একবার ঐ পাখীটার পালক পেলে যদি তোকে বাঁচানো যায়।

ইংরাজী বাংলা মিশিয়ে, অনেক বুঝিয়ে ও ভয় দেখিয়ে ভজাকে ভজাতে হল, আঙুলটা তুলে ধরে সে দেখিয়ে দিল পাশের বাড়ীর দেওয়ালের উপর

বসিয়ে রেখে সে সরে পড়েছিল, তারপর পাখীটার কি হল, সে খবর আর নেয়নি।

পাশের বাড়ীটা আবার এক দেশী সাহেবের। দেশী ও বিলাতী অনেক-গুলি মুরগীর চাষ তিনি করে থাকেন বটে। যা মেজাজ তার! সব সময়েই সেটা উচ্চ গ্রামেই থাকে। খাস বিলাতীর তাপ অনেকটা সহ্য হয়। কিন্তু এই মেকী সাহেবের আস্ফালন যেন সাহারার বালুঝড়। অথচ জীবটার উদ্ধারের আশাও ছাড়া চলে না। নিউমার্কেট থেকে নূতন একটা কিনে আনতেও অনেক খরচ। ঠিক এই রকম একটা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

সাহস সঞ্চয় করে সাহেবের দুয়ারে হানা দিলুম, কলিং বেলটা টিপতেই এক কুদর্শন সাহেব বের হয়ে এলেন।

কেতাবী বিশুদ্ধ ইংরাজীতে তাকে আমার মুরগীটার কথা জানালুম। প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সাহেবের ঘরেই তার আসবার কথা। এখানে তার বন্ধু বান্ধবদের ডাক শুনে অস্থায়ী আবাসটার পরিচয়ও বোধ হয় পাখীটা পেয়ে থাকবে।

সাহেব আমাকে অপাংক্তেয় দেখে ঘোৎ ঘোৎ করতে লাগলেন। খানিক পরে যা জবাব দিলেন, তাতে গালাগালি আর ব্যাকরণ ভুলগুলো বাদ দিলে তার অর্থ যা দাঁড়ায় সেটা আমার প্রতিকূল হয়েই দাঁড়ায়। মুরগী ফেরৎ দেওয়া তো দূরের কথা আমাকে অনধিকার প্রবেশের আইন দেখাতে লাগলেন।

শ্রীঘরের তোয়াক্কা রাখিনে, ছোটবেলায় গোঁয়ার গোবিন্দ বলে একটা সুনামই ছিল। গৃহিনীর শ্রীমুখের কৃপায় সে ভাবটা এখন অনেকটা কেটে গেছে। কিন্তু চাকরীর তোয়াক্কা'টাতো করতে হয়। মুরগী ফিরিয়ে না নিলে চলবেনা। আমিও কঠোর প্রতিবাদ জানালুম। বচসাটা ক্রমশঃ হাতাহাতির পর্য্যায়ে এগিয়ে গেল। হাতের আস্তিনটা গুটিয়ে সাহেবকে শিক্ষা দিবার

জন্য আমি এগিয়ে গেলুম। সাহেবটাও অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে আত্মরক্ষার প্রয়াসে পর্দ্দার আড়ালে আত্মগোপন করলেন। আমিও তাঁর সন্ধানে আরও একটু এগিয়ে যাবার উপক্রম করছিলুম এমনি সময়ে আমাদের উভয়ের মাঝে মেমসাহেব দাঁড়িয়ে আমার পথরোধ করে উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়া'ট ইজ দি ম্যাটার?

সুতরাং ব্যাপারটার পুনরুক্তি করতে হল।

মেমসাহেব উচ্চহাস্য করে বললেন, এই! এ নিয়ে ব্যস্ত হবার কি কারণ আছে। তুচ্ছ একটা ব্যাপার। মুরগীটা প্রাচীরের উপর বসেছিল দেখে বয়টি তার একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

মেম সাহেব বলে কি? এতক্ষণ বোধ হয় এদের ডিনারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মুরগীটা দিয়ে কারিই হোক কাটলেটই হোক একটা কিছু করেছে। মজাসে পেট ভরতি করবে দুজনে। এদিকে সত্যিকার মেমসাহেব বিলাত থেকে ফিরে এলে এটা কি আর বিশ্বাস করবেন? নানারকম চিন্তা আমাকে ঘিরে ধরল।

মেমসাহেব সহসা মুরগী আমি খেতে ভালবাসি কিনা প্রশ্নটি করে বসলেন। জবাব দেবার মতো মনের অবস্থা ছিলনা। তবু বিরক্তির সঙ্গে বললুম, সে খবরে আর কাজ কি, ম্যাডাম। গাছের গোড়া কেটে আগার জল ঢেলে লাভ কি? আর এক মেমসাহেবের সাধের মুরগী যখন পেটে পুরবার ব্যবস্থা কায়েম করে ফেলেছেন, আর আমার চাকুরীটিরও দফা নিকেশ হতে চলেছে, তখন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা কেন?

মেমসাহেব আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, সে কি?

আর একদফা ইতিহাস খুলে বলতে হল।

উচ্চ হাস্য করে মেমসাহেব বলে উঠলেন, মাই গড্। ওয়াণ্ডার ফুল স্পেকুলেসন আপনার। অঘটন কি ঘটেনি। চাকরটা অন্যের মুরগী দেখে উড়িয়ে দিয়েছে সেটাকে। অন্য কোন ছাদে হয়ত গিয়ে বসে থাকবে।

মেমসাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে আশে পাশের বাড়ীর ছাদের দিকে তাকাতে তাকাতে এগোতে লাগলুম।

পথে বিপিনদার সঙ্গে দেখা। আমার সন্ধানেই আসছিলেন। একটা ধাক্কা লেগে গেল তাঁর সঙ্গে।

ব্যঙ্গ করে বললেন তিনি, ভায়া, এই বয়সেই কি অন্যের বাড়ীর ছাদের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে হয়। বাড়ীর কর্ত্রী জানতে পারলে—

বিরক্তি প্রকাশ করে বললুম, বলব কি আর দাদা, সেই তো এ কাণ্ডটা ঘটালে। কাক শালিক দিনে একশবার রান্নাঘরে ঢুকে সব তচনচ করে ফেলছে, তাতে দোষ হয় না। অথচ মেমসাহেবের রাখা পাখীটা বাড়ীতে রাখা সহ্য হচ্ছে না।

বিপিনদা একগাল হেসে বললেন, যা বলেছো ওটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। নবীনের বাড়ীটা এখনও খালি পড়ে আছে। তোমার বাড়ীতে অসুবিধা হলে চড়ুই ভাতিটা—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, সেটা আর বরাতে নেই দাদা। মেমসাহেব যাবার আগে সে পথে কাঁটা দিয়ে গেছেন। বাচ্চাসুদ্ধ ফেরৎ দিতে হবে ওটাকে। কিন্তু এখন ওটা গেল কোথায়? আর এক মেমসাহেব তো দিব্যি ছাদ দেখিয়ে সরে পড়লেন। ওটা ওদের পেটেই গেল কিনা ঠিক বোঝা গেলনা। গৃহিণীর যা জিদ্। ডজার মারফৎ ওকে একবোতল চিকেন সুপ খাওয়াতে হবে। একবার রস একটু পেটে গেলেই বাস্, কোন চিন্তা আর থাকবে না। নইলে প্রমোশনের আশা ছাড়তে হবে।

বিপিনদা হাসতে লাগলেন। চিন্তিত মনে তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ীর দিকে ফিরতে লাগলুম। সব ছাদই খালি। কাক পক্ষীটিরও সাড়া পাওয়া গেলনা। পাখীটির আশা ছাড়তেই হল। মহানগরীর এতগুলো লোকের লুব্ধ রসনা থেকে তাকে রক্ষা করা যাবে কি প্রকারে?

গৃহিণীর চীৎকারের সুর কানে ভেসে এল। তিনি ক্রমাগত ভজাকে নানা রকম বিশেষণে আপ্যায়িত করে গালাগালাজ শুরু করে দিয়েছেন। বুঝলুম ভজার আর এক দফা পানের খরচ মঞ্জুর হল। কেননা এটার পরই সেটা হবার কথা।

বিপিনদাকে সঙ্গে করেই অন্তঃপুরে ঢুকে পড়লুম। এখানে তাঁর অবাধ গতি ছিল। গৃহিণী আমাকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবার উপক্রম করছিলেন কিন্তু বিপিনদার উপস্থিতিতে তার সুরটা নেমে এল। ভাষাটা মৃদু হলেও তার তীক্ষ্ণতা কম নয়।

রেগে জবাব দিলুম, পাখীটাকে উড়িয়ে দিলে তোমরা দুজন যুক্তি করে। আমাকে হয়রান করে ছাড়লে। এখন আবার আমার উপরই বাণীবর্ষণ চলছে।

গৃহিণী ফোঁস করে উঠে রোষ কষায়িত লোচনে বললেন, তোমার ভজাটাই যত নষ্টের গোড়া। অকর্মা উড়েটা তোমার সাধের ময়নাটাকে মেরে ফেলতে পারেনি। এখন আর সেটা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে বুকের উপর। দিব্যি বিছানায় শুয়ে বসে সব নোংরা করে দিল। দুপুর রাতে গঙ্গায় নাইতে যেতে হবে। গঙ্গাজল দিয়ে ঘরটা না নিকুলেও আর শোওয়া চলবেনা। দুত্তোর পাখীর নিকুচি করেছি। যত আপদ এসেছে বাড়ীর ভিতর।

বিপিনদা শুষ্ক মুখে বললেন, আজ তবে আসি ভায়া। পরিস্থিতিটা ভাল নয় দেখছি। অনুরোধ করেও তাঁকে বসাতে পারলুমনা।

মনটা একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ঘরে ঢুকে দেখতে পেলুম, বেশ নিশ্চিন্ত মনে সে সারাঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে আহার্য্যের সন্ধানে। একমুঠো ভিজে ছোলা ধরলুম তার মুখের সামনে।

গৃহিণী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, যত সব অলক্ষুণে কাণ্ড। বাতিক আর কি?

পাখীটাকে সন্তর্পণে তুলে নিয়ে খাঁচায় পুরে আবার বাইরের ঘরে রেখে দিলুম। গৃহিণী ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে লাগলেন সারা ঘরটায়।

সংসার চরিত্রম্

সকাল বেলায় একটা চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি, ছেলেমেয়েদের সাহায্যে পাড়ার সবলোক জড় করে জীবটির বিতরণের চেষ্টা করছেন। গ্রাহক সংখ্যা অনেক, কেউ এর দাবী ছাড়তে চায় না; তাই এ চেঁচামেচি। কেউ পাখীটা নিয়ে পালন করবার প্রতিশ্রুতি দিতে চায়না।

গৃহিণী জোরের সঙ্গে বললেন, ওটাকে আজই বিদায় করে ছাড়ব। হেসে বললুম, এতগুলো লোক জীবটির জন্ত জাত খোয়াতে রাজী আছে আর তুমি একটা কৃষ্ণের জীবকে বাড়ীতে রাখতেও নারাজ। এদের কেউ তো পুষতে রাজী হচ্ছেনা।

গৃহিণী ভিড়ের মধ্যে অহিংস লোকের সন্ধান করতে লাগলেন। আমিও নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরালুম।

কোটরগত চক্ষু, শীর্ণকায় এক ব্যক্তি এসে রোষনেত্রে জানাল, মিছামিছি সকাল বেলাটা নষ্ট করলেন কেন, মশায়? রক্তের ঘাটতি হয়েছে, ভাবলুম তাই নধরকান্তি পাখীটার রক্তে কিছু সুরাহা হয় কিনা। একটা মুরগী আপনার, আর বিলিয়ে দেবার জন্ত ডেকেছেন একটা হাটের লোক। একটা করে পালকও ভাগে পড়বেনা।

সহানুভূতির সুরে বললুম, তোমার যা অবস্থা তাতে পেটে এই বিলাতী জীব সইবে না। তুমি বরঞ্চ আণ্ডাবাচ্চার সন্ধানে থেকো।

লোকটা ভ্রুকুটি করে বলল, সকালবেলাটাই স্রেফ্ মাটি হয়ে গেল।

গৃহিণী তখন সমবেত দাবীতে ইচ্ছাতেও হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক সম্মতি জানিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টায় রত ছিলেন, ভজাটাও খাঁচার দরজাটা খুলে দিল। নদীর স্রোতের মত পিলপিল করে লোক ঘরে ঢুকে মুরগীটা নেবার জন্ত কাড়াকাড়ি আরম্ভ করল। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বাধা দেবার জন্ত উঠে দাঁড়ালুম। কিন্তু কে কার কথা শোনে। অনৈক সবল ব্যক্তি মুরগীটা আয়ত্তে এনে বেরিয়ে গেল। সবাই হৈ হৈ করে তার পিছু নিল। আমার কথায় কেউ ভ্রূক্ষেপও করলনা।

ক্ষীণব্যক্তিটি দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে অপসৃয়মান জনতার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, মুরগী খাওয়াচ্ছি ওদের।

গৃহিণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপদ গেল। জাত ধর্ম বাঁচবে এবার।

উঠবার উপক্রম করছিলুম। তিনি এসে বাধা দিলেন, কোথাও যেতে পারবেনা এখন। শেষটায় একটা হাঙ্গাম হুজ্জত বাধিয়ে বসবে।

শুষ্ককণ্ঠে জানালুম, সে কি হয়? মেমসাহেবের মুরগী আমার প্রমোশনের দূত। ওটাকে হাত ছাড়া করা চলেনা। তাছাড়া, হিন্দু হয়ে এতোগুলো লোকের জাত আর নষ্ট হতে দিতে পারিনে।

গৃহিণী বিরক্তির সুরে বললেন, চুলোয় যাক ওরা। আমাদের জাত ধর্ম বজায় থাকলেই হল।

সে যে নেই, ইতিপূর্ব্বেই নিষিদ্ধ পক্ষী উদরে ঢুকে সেটা নষ্ট করে দিয়েছে এ গোপন কথা প্রকাশ করে গোময় ভোজনে ঘোরতর আপত্তি ছিল। তাই চুপ করে রইলুম।

গৃহিণী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বাজার থেকে আণ্ডা বাচ্চা আর ধাড়ী একটা কিনে তোমার মেমসাহেবকে দিয়ে এসো, তাহলে মাইনে বাড়িয়ে দেবে চতুর্গুণ। বিশ্বাস না করে দুচারটে কথা গুছিয়ে বলো। কতকথা গুছিয়ে বলা তোমার অভ্যাস আর এটা পারবে না। হিন্দু বাড়ীতে মুরগী পোষা।

বিরক্ত প্রকাশ করে বললুম, তোমার কথা শুনতে হলে মেমসাহেবকে গোটাকত হাঁস কিনে দিতে হয়।

রেগে বললেন তিনি, নাও আর কথার ব্যাখ্যান করতে হবে না। সারারাত ম্লেচ্ছ পাখীটা নাড়াচাড়া করেছো। গঙ্গায় গিয়ে একশ আটটা ডুব গুণে গুণে দিয়ো। পাপের একটা প্রাচিত্তির দরকার। আমার যা গেয়ো। আজ আর আপিসের ভাত দিতে পারব না।

একটা গামছা আমার কাছে ফেলে দিয়ে তিনি দুম দুম করে পা ফেলে চলে গেলেন। বাইরের ঘরটায় শুয়েছিলুম কাল। সারারাত ছারপোকা কামড়ে অর্দ্ধেক রক্ত শুষে নিয়েছে। প্রমোশনের জন্য নিত্য নূতন ঝামেলা আর সহ্য হয় না। গামছা কাঁধে নিয়ে গঙ্গাস্নানের জন্য বের হলুম।

পথে পোষ্টাফিসের পিয়ন চিঠি বিলি করে দিল। বিলাতী ডাকের চিঠি দেখে কৌতুহলী হয়ে চিঠিটা পড়লুম। মেমসাহেবের লেখা চিঠি। লিখেছেন তিনি, এয়ারজার্নিটা ভালই হয়েছে। জনি, টম এরা নাকি ইণ্ডিয়ার কথা ভুলতে পারে নি। মুরগীটা আমার কাছে ভালই আছে আশা করে তিনি পত্রখানার ইতি করেছেন।

গঙ্গাস্নানটা কোন মতে সেরে চিঠিখানার কথাই বোধ হয় একশ আটবার ভেবে বাড়ী ফিরলুম। দেখলুম্ বৈঠকখানা ঘরে একজন সার্জ্জেণ্ট বসে সিগারেট টানছেন। অদূরে দুটি ভোজপুরী কনেষ্টবল দিব্যি গোঁফে তা লাগাচ্ছে।

ভাল আপদে পড়া গেল দেখ্ছি। ঐ কালো সাহেবটা বোধ হয় ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসেছে। কাল যা আইন দেখাচ্ছিল, আজ সকালেই তার মহিমা প্রয়োগ করে বস্বে কে জানত। সারা দিনটাই আজ ভাল ভাবে কাট্বেনা দেখ্তে পাচ্ছি।

সার্জ্জেণ্ট মুরগীটার কাহিনী জানতে চাইল। উৎসাহের সঙ্গে রং চড়িয়ে ব্যাপারটা জানালুম তাকে। ঔদরিক মুরগীলোভীদের সম্বন্ধে মৃদু একটা ব্যবস্থাপনারও অনুরোধ জানালুম। মেমসাহেবের লেখা চিঠিটা হাতের মুঠোয় ছিল। সেটাও তাকে পড়তে দিলুম।

সার্জ্জেণ্ট গম্ভীর হয়ে বলল, মুরগীটা উদ্ধার করা হয়েছে। ব্যবস্থাও একটা নেওয়া হবে।

পরদিন মুরগীটা আবার ফিরে এল আমার কাছে। ব্যবস্থাটা কি হল জানতে পারলুম না। তবে প্রতিবেশীরা অফিসে যাবার পথে অন্তরাল থেকে ভাংচাতে লাগল।

দিন সাতেক এমনিভাবে কেটে গেল। গৃহিণী ও ভজা উভয়ে মিলে জীবটাকে বিদায় দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রতিবেশীরা আর কেউ এগোতে সাহস পেল না বরঞ্চ নানান কথা শুনিয়ে দিল। কোন উপায় না দেখে ভজা খাঁচার দরজা খুলে রেখে তাড়া লাগাতে আরম্ভ করল। কিন্তু মুরগীটা খাঁচার মায়া ত্যাগ করতে চাইল না। বরঞ্চ ভজাই তাড়া খে'ত লাগল। অগত্যা গৃহিণী একটি সারমেয় সংগ্রহ করে জীবটিকে তারই কাছে সমর্পণ করবার আদেশ দিলেন। কিন্তু ভজা তাতে রাজী হল না।

নিশ্চিন্ত মনে আফিস করতে লা'গলুম। পুলিসের ছোঁয়া লেগেছে মেম-সাহেবের মুরগীর গায়ে, সহসা ওর কিছু হচ্ছে না।

পক্ষান্তে একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি মুরগীটা খাঁচা থেকে উধাও হয়েছে। নানা রকম জেরায় প্রকাশ পেল, শ্যালক প্রবরের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি ওটা চিড়িয়াখানায় সমর্পণ করার প্রস্তাব জানালে গৃহিণী সানন্দেই সেটা তার হাতে সমর্পণ করেছেন। ভজা তার মুসলমান পিওনটাকে ডেকে এনে তার হাতে গছিয়ে দিয়েছে। আজ রাতেই সুন্দর একটা চিড়িয়াখানায় স্থান পাবে সেটা।

কোথায় ও কেমন করে ওটা আশ্রয় পাবে তা বুঝতে আর বেগ পেতে হল না। শ্যালক মশায়ের ওটা অতি প্রিয় গোপন খাদ্য। ওর উদরটাই একটা আস্ত চিড়িয়াখানা। মুরগীটার ইতিহাসও তার অজানা নয়। এটা যে প্রিয় হলেও ভক্ষ্য নয় এটা তিনি বেশ জানতেন। অথচ সব জেনে শুনেও এমন বিরোচক পথ্য তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? মনটায় অভিমান আর বিরক্তি যুগপৎ দেখা দিল।

গৃহিণী ঈষৎ হাস্য করে বললেন, বালাই গেছে। ও নিয়ে আর আক্ষেপ করোনা। আজ রাতে তোমাকে কচি পাঁঠার মাংস খাওয়াব। দাদা পাঠিয়ে দেবেন বলে গেছেন। একটা পাঁঠা কাটা হয়েছে ও বাসায়।

কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষ মাস। চললাম আমি শ্যালকের সন্ধানে।

দেখি শ্যালক মশায়কে বলে কয়ে জীবটা ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় কিনা। এখনও হয়ত জ্যান্তই রয়েছে।

গৃহিণী হাস্‌লেন। অত্যন্ত অর্থপূর্ণ সে হাসি।

শ্যালক মশায়কে অনুরোধটা জানালুম। তিনি হেসে আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে বস্‌লেন, ওরকম হাজার গণ্ডা মুরগী নিউ মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। মেমসাহেব ওটা মুখস্থ করে রেখেছে নাকি? আর একটা মোটা সোটা কিনে দিয়ো। তাছাড়া ওটা এখন উনুনে উঠেছে। কাট্‌লেট, কাবাব ইত্যাদি হচ্ছে। দু প্লেট খেয়ে যাবে আজ।

শুষ্ক কণ্ঠে জানালুম, বাড়ীতেও কচি পাঠার নিমন্ত্রণ। এখান থেকেই তো সেটা যাবার কথা।

শ্যালক মশায় মাথা দুলিয়ে বললেন, তা হোক্, খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। লেগ্‌হর্নের কাছে কচি পাঠা। মেমসাহেবের বাছা জিনিষ হে। পরখ করে যাও। সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করছি। ফেরবার পথে দু প্লেট খেয়ে যাবে।

অগত্যা সম্মতি দিতে হল। গৃহিণীর সহোদর। মেমসাহেবেরও বাড়া। আপত্তি করে ঘরে বাইরে অশান্তির মাত্রাটি বাড়িয়ে লাভ কি? প্রমোশন হবে না বুঝতেই পারছি, তাই বলে দুপ্লেট মায়া কাটিয়ে গেলে, এ সুযোগ আর সহসা পাওয়া যাবে না।

সিনেমা দেখে ফিরে এসে কাঁটা চামচ নিয়ে টেবিলে বসে পড়লুম। দু প্লেট খাবার এল। আমি খেতে আরম্ভ করলুম, কিন্তু কেমন যেন ভাল লাগ্‌ছিল না। শ্যালক মশায় আমাকে উৎফুল্ল রাখবার জন্য অনর্গল বক্তৃতা চালাচ্ছিলেন, হঠাৎ আমার অসোয়াস্তি ভাব দেখে ঠাট্টা করে বলে উঠ্‌লেন, কি হে, মেমসাহেবের মুরগী মুখে রুচ্‌ছেনা, কেমন?

স্বাদটা যেন কেমন লাগ্‌ছিল। মেমসাহেবের দৌলতে লেগহর্নের স্বাদ আমার অজানা ছিল না। এর স্বাদটাও মন্দ নয়, তবে লেগহর্নের নয় এটা ঠিক। সন্দেহের কথা শ্যালক মশায়কে জানালুম।

শ্যালক মশায় নিজে একটু মুখে দিয়ে বল্লেন, ঠিক্তো।

জেরায় প্রকাশ পেল, মাংসটা নাকি অদল বদল হয়েছে। অর্থাৎ কচি পাঁঠার পরিবর্তে গৃহিণীর কাছে পাঠানো হয়েছে মেমসাহেবের খাঁটি লেগহর্নের মাংস।

কাঁটা চামচ ফেলে উঠবার উপক্রম করতেই শ্যালক মশায় বাধা দিয়ে বললেন, যা হয়েছে, তার চাড়া নেই। দু প্লেট খেয়ে চুপচাপ বুদ্ধিমানের মতো থাক।

কোন মতে দু প্লেট গলাধঃকরণ করে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুটলুম। আহারটা হয়ত তার এখনও সমাপন হয় নি। মাথা ধরার অজুহাতে শ্যালক মশায় আর সঙ্গে এলেন না।

বাড়ীতে ঢুকতেই গৃহিণী সহাস্য মুখে বললেন, পাঁঠাটা কচিই ছিল। কি চমৎকার খোসবো তার!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। ঠিক বুঝ্তে পারলুম না, তিনি কি ইঙ্গিত করছেন।

গৃহিণী আবার বললেন, তুমি কি দাদার ওখানেই খেয়েছো? তুমি ওখানেই খাবে জানিয়েছিলেন।

আমি সংক্ষেপে জানালুম, হুঁ।

তিনি আবার বললেন, দাদা যা কেনেন, ভালই কেনেন। পাঠা'টা কেমন কচি ছিল। খেতেও ভাল, তাই নয়?

গৃহিণী নিশ্চয়ই সব টের পেয়েছেন। সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তোমার এখনও খাওয়া হয়নি বোধ হয়।

গৃহিণী হাসলেন। বুঝলুম, টের পেয়ে যাননি কিছু। বললুম, একপ্লেট খেয়ে এসেছি মাত্র। আমার রান্না হয়নি বোধ হয়।

বললেন তিনি, খবরটা এসেছিল, ভাত নামানোর পরে, বসো তুমি।

ঠিক করলুম আহারান্তে জানাতে হবে ঘটনাটা। লেগহর্নের স্বাদটা থেকে এখন বঞ্চিত হয়ে লাভ কি?

নিশ্চিন্ত হয়ে আহারে বসলুম। গৃহিণী ক্রমাগত মাংসটার প্রশংসা করে চললেন। কচি পাঁঠার মাংসটা নাকি আজ অতি উপাদেয় হয়েছে তার রান্নার ফলে, এই কথাটা বারবার জানাতে লাগলেন। ঘন ঘন আড় নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে, হাসিটা গোপন রেখে আমি আমার প্রমোশন মগ্ন হবার ভোজন সেরে নিলুম।

গৃহিণী পানের ডিবেটা এগিয়ে দিলেন। একটা পান তুলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বললুম, একটা রাত না খেলে কি হয় বলত!

গৃহিণী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, কি আবার হয়, কত রাত তো ইচ্ছে করেই খাইনি।

একটু চুপ করে থেকে বললুম, নাই বা খেলে আজ রাতে।

তিনি উৎকণ্ঠা ভরে বললেন, কেন বলত? এমন কথাতো কোন দিন তুমি বলনি।

গম্ভীর হয়েই বললুম, তোমার দাদা এক মস্ত ভুল করেছেন। কচি পাঁঠার পরিবর্ত্তে মেম সাহেবের পাখীটাই ভুল করে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, বল কিগো? এমন সর্ব্বনেশে কথা।

জিজ্ঞেস করলুম, তাতে কি হল, তুমি খাওনি তো?

দ্রুতপদে তিনি রান্নাঘরে গেলেন। মাংসের বাটিটা দু একবার নাড়া চাড়া করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন; এ শুধু তোমারই ষড়যন্ত্র। তোমারই কীর্ত্তি। আমাকে—আমাকে—

কথাটা শেষ করলেন না তিনি। ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে তিনি পিত্রালয়ে চলে গেলেন। আমার অনুরোধ উপরোধ সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

ঘোরতর একটা অনর্থের মধ্যে পড়ে গেলাম আর কি!

ভাবয় নিত্যম্

ঋনম্ কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেৎ।

কোন কুশাগ্রধী মহাপণ্ডিত এই চরণটি রচনা করেছিলেন, এ দুর্দ্দিনে সেটা মনে পড়েও পড়েনা। তবে তার অর্থটা বুঝবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়েই এই ফ্যাসাদটা ঘটল।

শ্লোকটা মূল্যবান হলেও বহু পুরাতন শতাব্দীর। ঋণ বা ঘৃত দুটোই বর্ত্তমানে কালবাজারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঋণ ডুমুরের ফুল আর ঘৃতের স্থান অধিকার করেছে বনস্পতি।

সুবিমলদার সঙ্গে পথে দেখা। শুভ্রদন্ত বিস্তৃত করে তিনি একটু হাসলেন। দূরে থেকেই হাসলেন। তাইতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। অত্যন্ত অর্থপূর্ণ সে হাসি। শুষ্ক কণ্ঠে একটা মলিন হাসি হেসে পাশটা কাটালুম। সুবিমলদার সাদা দাঁতগুলো যেন মগজ কামড়াতে সুরু করে দিল।

ঘটনাটা সামান্য। সুবিমলদার কাছ থেকে দুর্লভ ঋণ গোটা পঞ্চাশেক টাকা পেয়েছিলুম। ঘৃত কেনার সৌভাগ্য তাতে হয়নি। রেশনের চাল আটা ইত্যাদি কিনতেই সেটা প্রায় ফুরিয়ে গেছল। আধুনিক ঘৃত বনস্পতির একটা ছোট টিন কিনে, বিখ্যাত শ্লোকটার মর্য্যাদা রক্ষণে প্রয়াসী হয়েছিলুম।

গৃহিণীকে সুবিমলদার হাসির অর্থ জানালুম। ঠোঁট উলটিয়ে জবাব দিলেন তিনি, হাসবেই তো? রাস্তার মধ্যে টাকা চেয়ে কাঁদলেই বুঝি ভাল হত।

নির্ব্বাক হলুম একথায়। সেই শ্বেত শুভ্র দন্তরুচি কৌমুদীর হাসিটার ইস্পাতের ফলার তীক্ষ্ণতা গৃহিণীকে বোঝানো যায় কি প্রকারে?

তবু খানিক পরে বললুম, তিনি তো হাসেননি। মৃদু হাসার ভান করে আমাকে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন।

রেশনক্লিষ্ট ক্ষীণ দেহটা এক অপূর্ব্ব লীলায়িত ভঙ্গীতে আলোড়ন করে তিনি বললেন, কাল আবার পথে দেখা হলেই আর কিছু টাকা ধার চেয়ে বসো. তাহলে হাসিটা থেমে যাবে, তোমায় দেখে পালিয়ে বেড়াবে।

মনটা হালকা হয়ে এল। এই অমোঘ ঔষধটা যেন দিব্য দৃষ্টি খুলে দিল। ভাবলুম, আর এক দফায় টাকা জোগাড় হলে ভেষজ ঘৃতে আটার টাটকা লুচির ব্যবস্থা হতে পারে। রেশনে আজকাল চালের পরিবর্ত্তে আটাই দিচ্ছে বেশী। বেতন পাবার আরও কদিন দেরী আছে। সমস্ত বুঝে সুঝে ব্যবস্থা প্রয়োজন। নইলে মাসের শেষ দিনগুলোতে দুর্ভিক্ষের মড়ক লাগবে। তবে চিন্তার কথা, সুবিমলদার আবার আমার মতই কলম পেষার চাকরী।

গৃহিণী ক্রমাগত টাকার জন্য তাড়া দিতে লাগলেন। জমার হিসাবে শূন্য অঙ্কটা বেশ জলজল করে জলছে। খরচের খতিয়ানকে লাগাম টেনেও বাগ মানানো যাচ্ছে না। পঙ্গপালের মত ঘিরে আসছে তারা। একটাকে তাড়াতে দশটা এসে পড়ে।

গঙ্গার ধার দিয়ে অফিসে চলেছি। পথটা একটু ঘুরো হয় সদর রাস্তা বেয়ে চললে, চারিদিক থেকে দোকানদারদের যা সাদর সম্ভাষণ। আফিস পর্য্যন্ত কোন দোকানেই তা আর হিসাবের অস্ত রাখিনি। ডিনারনেসের বেড়াজাল দিয়ে খরচ সমুদ্রের কতটুকু ঘিরে রাখব।

জলের পাত্রটা সঙ্গে নিয়েছি। টিফিনের বাক্সটা আজ আর আনা সম্ভব-পর হয়নি। খাদ্যসংস্থা অপ্রতুলতায় গৃহিণীর মধুর বাণীতে সাহসই হয়নি সে প্রসঙ্গ তুলতে। ছাতু কেনার জন্য এক চেনা দোকানীর সামনে দাঁড়ালুম। শ্লোকটা মনে পড়ে গেল। দেখি যদি ধারে পাওয়া যায়। নইলে পকেটে একটা ডবল পয়সা তো আছেই।

সংসার চরিত্তম

"নমস্কার।"

পিছনে চেয়ে দেখি জলধর সাহা। চেহারাটা ভীমনন্দনের মতো হওয়ায় সবাই একে ঘটোৎকচ বলে ডাকত। এর বাণীগুলো আবার তেমনি তীক্ষ্ণ।

শুষ্ক কণ্ঠে বললুম, নমস্কার, সাহাজী যে! গঙ্গাস্নানে চলেছেন বুঝি?

অবশ্য এ পোষাকে তার গঙ্গাস্নানে যাবার কথা নয়। গায়ে একটা মেরজাই, হাঁটুর উপর কাপড় পরা, পায়ে পুরানো চটি ও হাতে তার খেরুয়া বাঁধা খাতা। তাগাদায় বেরিয়েছেন বোধ হয় অথচ সে কথাটা উল্লেখ করা চলে না।

সাহাজী ফোক্‌লা মুখে মধুর হাসি হেসে বললেন, কি দৌড়টাই দিতে হয়েছে আপনার জন্য। বাড়ী গিয়ে শুনি অপিসে বেরিয়েছেন এইমাত্র সদর রাস্তায় দেখি পাত্তা নেই। তাই গঙ্গার ধার দিয়ে ছুটে আসতে হয়েছে।

একটু বিরক্তির সঙ্গে বললুম, বেশ ত, অন্য সময় যাবেন। রাস্তায়—

বাধা দিয়ে সাহাজী বললেন, বাড়ীতে দেখা পেলে আর কে রাস্তায় ঘোরে মশায়। আপনার পিছনে ঘুরতে ঘুরতে হয়রান্ হয়ে গেলুম। তা আমার পাওনাটা মিটিয়ে দিলেই আর ঘোরাঘুরি থাকেনা।

আমার কোন কথার অপেক্ষা না করে তিনি খাতাটা খুলে আমার চোখের সামনে ধরে বল্লেন, এই দেখুন দোকানের আসল পাওনা ছত্রিশ টাকা নয় আনা পাঁচ গণ্ডা আর তার সুদ তের টাকা ছয় আনা দশ—

বাধা দিয়ে বললুম, সুদ আবার কিসের?

সাহাজী চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, টাকা বাকী রাখলে সুদ হয় এটাও জানতে চান না বুঝি! শুধু সুদ নয় তস্য সুদ, তস্য সুদ—

থামিয়ে দিয়ে বললুম, থাক এখন আপনার তস্য সুদ। আমার আবার অফিসের বেলা হয়ে গেল।

সাহাজী হেসে বললেন, তা থাক কিন্তু টাকাটা সুদে আসলে কখন মিটিয়ে দিচ্ছেন ?

সাহাজীর দন্তহীন হাসি মনটাকে তেতো করে তুলল। অফিস যাবার পথে এ আবার কি অদ্ভুত অভিযান। ভাবলুম গৃহিণীর ব্রহ্মাস্ত্রের পরীক্ষাটা এর উপরেই একবার হয়ে যাক্ না কেন ?

গম্ভীর হয়ে বললুম, নিশ্চয়, নিশ্চয়, সাহাজীর পাওনা মিটিয়ে তবে আমার অন্য কাজ। অনেকদিন হয়ে গেল বোধ হয় টাকাটা।

সাহাজী কৃতার্থ হয়ে বললেন, আ.জ্ঞ তিন বছর।

তৎক্ষণাৎ বলে উঠলুম, অনেকদিন হয়ে গেল। তাইতেই তো এত সুদ হয়েছে। এবার সব শোধ করে দেবো। ভাল কথা সাহাজী, ভাল ঘি আপনার দোকানে আছে শুনেছি। সের পাঁচেক ঘি আমার খুব দরকার। এখুনি যেরে পাঠিয়ে দেবেন। বিকেলে আপনার সব টাকা মিটিয়ে দেবো।

সাহাজী বিমর্ষ হয়ে চলে গেলেন। বিকাল বেলায় ঘি আর সাহাজীর খেরুয়া খাতাটার সন্ধান পেলুম না। সাহাজী হয় ত সহজে ভিড়বে না। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। সদর রাস্তা দিয়ে যাবার একটা বাধা কমল।

রাত শেষ না হতেই কিউএ এসে দাঁড়াতে হল। রেশনের চাল পাওয়া যাবে। দিনের আলোতে কিউএর ল্যাজে দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা ও বিরক্তি দুটোই দেখা দেয়। তাছাড়া বিলম্বে এলেই অন্তহীন কিউএর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হয় সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, নয় হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। দোকানীর যে কখন মর্জি হবে ঠিক নেই।

ল্যাজটা ছোট হলেও সার্পেন্টাইন গলির মতো এঁকে বেঁকে গিয়েছে। সামনে ও পেছনে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে অস্পষ্ট আলোতে বোঝার উপায় নাই। শুধুমাত্র সাম্‌নে থেকে শাড়ীর খস্‌খস আওয়াজ ও চুড়ির শব্দ মাঝে মাঝে

শোনা গেল। ভাগ্যিস গৃহিণী সঙ্গে নেই। নইলে শেষ রাতে এসে রেশনের চাল নেবার চেয়ে তিনি কালো বাজারই পছন্দ করতেন।

বাসাটা কাছেই। জানালা থেকে কিউটার কিছুটা অংশ দেখা যায়। ছাদের উপর থেকে সবটাই দেখা যায়। খোলা ছাদটায় আবার গৃহিণী মাঝে মাঝে এসে পায়চারী করে থাকেন।

কিউএর কোথায় স্থান পেয়েছে অন্ধকারে সেটা ঠাহর করতে পারলুম না। ভাবলুম, অন্ধকারেই কাব্যটা জমে ভাল। দিনের আলোয় কিউএ দাঁড়ানো নীলাম্বরী শাড়ী, কাঁচের চুড়ি ও ফোকলা দাঁতে কাব্যের অপঘাত মৃত্যু ঘটে যাবে।

ভোরের অস্ফুট আলো ফুটে উঠল। দীর্ঘকাল কিউএ দাঁড়িয়ে শরীরটা যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল। পেছন থেকে ঠেলাঠেলির ফলে কিউটা প্রবল বেগে নড়ে উঠল। আমিও হুমড়ি খেয়ে সামনের নীলাম্বরী গায়েব উপর টলে পড়ে কোনমতে সামলে নিলুম।

ক্রুট্।

চমকে উঠলুম এই অশোভন উচ্চারণে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীব জন্য আমি দায়ী নই। তাই এই সম্বোধনের জন্যও প্রস্তুত নই। আমারও পৌরুষ এই মধুর সম্ভাষণে জেগে উঠল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলুম, ন্যুইস্যান্স।

শাড়ীসুদ্ধ রেশনের ব্যাগটা মাথার উপর উঠল। চুড়িগুলো আবার ঝনঝন করে বেজে উঠল। শিভালরির বহর দেখে আত্মরক্ষার জন্য নিজের ব্যাগটিও তুলে ধরলুম তার দিকে। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

দুজনার ব্যাগটাই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলুম অনেকক্ষণ। কেমন যেন চেনা মুখ।

হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, সুপ্রীতি! তুমি!

ব্যাগটা নেমে এল দুজনারই। নীলাম্বরী বিস্ময়ে প্রকাশ করে বলে উঠল, তুমি? এখানে, এতদিন পরে দেখা হল।

কিউএর ল্যাজ ভেঙ্গে যারা বের হয়ে এসেছিলেন, তাঁরা হতাশ হয়ে আবার ল্যাজের শেষে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ভিতরে আর স্থান হল না তাঁদের।

অনেক দিনের কথা মনে পড়ল আমার। কলেজে তখন আমরা এক সঙ্গেই পড়তুম। পড়াশোনায় সুপ্রীতি বরাবরই ভাল ছাত্রী। পরীক্ষা সাগর উত্তীর্ণ হবার জন্য ওর লেকচার থেকে নেওয়া নোট আমার কত উপকার করেছিল। ক্লাস কামাই করেও রোমাঞ্চ কত। হোটেলে রেস্তোরাঁয় সুনীতির পয়সায় কত নিষিদ্ধ পক্ষীর রকমারী আহার্য্য পেটে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। দীর্ঘকাল পরে বাতের চেতনায় কাতর দেহের ভেতর থেকেও সেই তারুণ্য যেন উঁকি ঝুঁকি দিতে আরম্ভ করল। সংসারের আবর্ত্তে হাবুডুবু খেয়ে ফাইল আর রেশন নিয়ে নিরন্তর হাবুডুবু খাচ্ছি। সুনীতি পরীক্ষায় ভাল ফলই করেছিল। কী জানি কোন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সে চাকুরী নিয়ে কোথায় চলে গেল, তারপর আর খবর পাইনি। দীর্ঘকালের অদর্শনে স্মৃতিতেও যেন মরচে পড়েছে। হঠাৎ এতদিন পরে দেখা হয়ে সে সব চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে।

অবাক্ হয়ে বললুম্, তুমি এখানে কতদিন?

হেসে বলল সে, তাইতো, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আবার এমনি ভাবে। এক যুগ কেটে গেছে নয়?

সহাস্যে জবাব দিলুম, রেশনের ব্যাগটা মাথায় পড়লেই ভাল হতো। তিনসের পাঁচ ছটাক চালের পরিবর্ত্তে ঐ-টেই বরণ করে নিতুম।

সুপ্রীতি হাসতে লাগল। খানিক পরে বলল, তাতে আর যাই হোক পেট ভরতোনা।

চেয়ে দেখলুম। সে সুপ্রীতি আর নেই। হাসিতে আর সেই মাদকতা নেই; বাঁধানো দাঁতগুলো হাসির স্পন্দনের সঙ্গে উঠানামা করছে। বোধ হয় ভাল করে ফিট করেনি। মাথার পাকাচুলগুলো বেশ স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে। যৌবন সুলভ চঞ্চলতায় যেন মোহ মুদ্গরের ব্যবস্থাপনা।

বললুম, তোমাকে এমন ভাবে দেখতে পাব, ভাবতে পারিনি।

সুপ্রীতি লজ্জার ভান করে বললে, ঝিটা কদিন থেকে আসছেনা। তাই নিজেরই আসতে হয়েছে। রেশন বাদ দেওয়া চলেনা, অথচ নেওয়াও মুস্কিল।

সাহস জানিয়ে বললুম, তাতে কি হয়েছে। এখানে সবাই সমান। রেশন ছাড়া চাল পাওয়া যায় কালোবাজারে। তারপর, তুমি এ সহরে কতদিন?

সুপ্রীতি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, তা প্রায় মাস খানেক, স্কুলের মাষ্টারী নিয়েছি একটা। স্কুল হোষ্টেলে স্থান পাইনি, তাই একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছি।

রেশনের দোকানটা খুলে গেল। কেউ এর ল্যাজে একটা প্রচণ্ড স্পন্দন ধরা পড়ে গেল। লঙ্কাকাণ্ডের পূর্ব্বাবাস কিনা কে জানে?

সুপ্রীতি বলতে লাগল, চাল কটা তাড়াতাড়ি পেলে আবার চিনির দোকানে যেতে হবে। চা খাওয়া হয়নি কাল থেকে চিনির অভাবে।

কৌতূহলের ভান করে বললুম, বটে! গুড়ের সঙ্গে পরিচয় হয়নি বুঝি? চায়ের সঙ্গে সেটাই জমে ভাল।

সুপ্রীতি হেসে বললে, নাঃ এটা এখনও রুচিকর মনে হয়না। অবশ্য মাঝে মাঝে স্যাকারিন ব্যবহার করে থাকি।

কি যেন একটা বলতে চাচ্ছিলুম, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলে উঠ্‌লেন, মশায়, বাড়ী গিয়ে রসালাপ করবেন। এদিকে কিউ যে ভেঙ্গে পড়ল। এগিয়ে যান।

ক্রুদ্ধ হতে যাচ্ছিলুম এ কথায়। সুপ্রীতি হেসে দেখিয়ে দিল, সত্যিই কিউয়ের মাঝে খানিকটা জায়গা ফাঁক হয়ে পড়েছে। এগিয়ে গিয়ে আবার ল্যাজ জোড়া দিতে হবে।

রেশন নেওয়া শেষ হলে সুপ্রীতি বাসার ঠিকানা জানিয়ে অনুরোধ জানালো, যেয়ো একবার বিকালে। ফাউলের কাটলেট খেয়ে এসো।

সুপ্রীতির ওটা নিত্য আহার্য্য। সমাজ ও ধর্ম্মে বাধে না। কিন্তু আমার কলেজ ছাড়ার পরে লুকিয়ে খাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। গৃহিণী সম্প্রতি আবার হরিনামের মালা ধরেছেন। দিনে চুঘণ্টা জপে পরকালের পথ পরিষ্কার করে রাখছেন। নিরামিষের জ্বালায় অস্থির হতে হয়।

বললুম তাকে, আচ্ছা দেখব।

সুপ্রীতি মাথা দুলিয়ে বলল, আর দেখা নয়! নিশ্চয় এসো। স্থির পদে সে চলে গেল চিনির সন্ধানে। আমি আপন মনে ফিরে চললুম। পূর্ব্ব কথাগুলো মনের সামনে এসে জটলা পাকাতে সুরু করল।

ব্যাগটা রাগতে না রাখতেই গৃহিণী ছুটে এলেন। রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, এত দেরী হল কেন?

উত্তর দিলুম, চাল পাওয়া এত সহজ নয়। কিউএ দাঁড়িয়ে পা গুলো জমাট বেঁধে গেছে।

গৃহিণী গম্ভীর হয়ে বললেন, হুঁ; আমি আর দেখিনি বুঝি। রেশনের চাল আনতে যাওয়া তোমার একটা ছল মাত্র। ঐ শাড়ীপরা মেয়েটার সঙ্গে তোমার এত গায়ে পড়া ভাব কেন?

আমিও গম্ভীর হয়ে জবাব দিলুম, ও তুমি বুঝবেনা।

তিনি জেরার উপর জেরা আরম্ভ করলেন। সত্য মিথ্যা অনেক কিছুই বাধ্য হয়ে বলতে হল। কি কুক্ষণেই যে শেষ রাতে চাল আনতে গেছলুম।

গৃহিণীর জেরা আরও কিছুক্ষণ চলত। কিন্তু সমাপ্তি ঘটালো পাশের বাড়ীর ছোট একটা মেয়ে এসে।

বললে সে, মাসী, ও আমাদের ইস্কুলের বুড়ী দিদিমণি। সেদিন পড়াবার সময় দাঁতগুলো খুলে পড়ে গেছল। ক্লাসের মেয়েদের সে কি হাসি।

গৃহিণী আশ্বস্ত হলেন। আমিও হাঁফ্ ছেড়ে বললুম, গোটাকতক টাকা ধারের চেষ্টায় আছি। বিকালে আবার যেতে বলেছে।

গৃহিণী চুপ করে রইলেন। কথাটার জবাব পেলুম আফিস থেকে ফিরবার পর। ঘনঘন তাড়া লাগাতে লাগ্‌লেন তিনি, টাকাগুলো আনবার জন্য। ফলে ধুলো পায়েই আবার রওনা হতে হল। বিকালের খাবার বাড়ীতে জোটার সম্ভাবনা নেই। আজ সবই বাড়ন্ত। সুপ্রীতির ওখানে গেলে, নিদেন ছু একটা কাট্‌লেট পাওয়া যাবে। ক্ষুধায় যা পেট চোঁ চোঁ করছে।

কাটলেট বা টাকা কোনটাই পাওয়া গেলনা। কয়লার অভাবে কাটলেট তৈরী করা সম্ভবপর হয়নি তার। কাগজ পুড়িয়ে নিয়ে শুধু এককাপ চা তৈরী করল। যথালাভ।

কথায় কথায় জানা গেল, সুবিমলদার সঙ্গে সুপ্রীতির আগে থেকেই অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে। টাকার জন্য তার নামে একটা সুপারিশ পত্র লিখে দিল। আবার যেতে হবে সুবিমলদার কাছে টাকার প্রত্যাশায়। অথচ এছাড়া উপায়ও নেই। মনটা তিক্ততায় ভরে গেল।

জমার খাতায় শূন্য অঙ্কটা মনের কোঠায় ঘুরপাক খেতে লাগল। অন্যমনস্ক ভাবে এগোতে লাগলুম সুবিমলদার বাসার দিকে। টাকা তার কাছে পাওয়া যাক নাই যাক, দেখা হলেই সেই অর্থবোধক শ্বেতদন্ত শোভিত হাসিটা বন্ধ হবে তো।

চিঠিখানি বার কতক এপিঠ ওপিঠ পড়ে শুনে সুবিমলদা বল্‌লেন, সুপ্রীতি লিখেছে, না বলবার উপায় নেই আমার। কিন্তু এখন মাসের শেষ, টাকাও আমার কাছে নেই। তাছাড়া, অনেক টাকাই তো বাকী রয়েছে তোমার কাছে।

জানতুম ধারের উল্লেখ করতে সুবিমলদা ছাড়বেন না। এবং টাকাটাও সহজে দিতে চাইবেন না। তবু সাহস সঞ্চয় করে বললুম, কোন চিন্তা নেই সুবিমলদা, মাস গেলেই সব মিটিয়ে দিতে পারব।

সুবিমলদা মিষ্টহাসি হেসে বল্‌লেন, একথা তো প্রতি মাসেই শুনে আস্‌ছি তোমার কাছে।

কথাগুলো যেন মিছরী। বুঝলুম, অনর্থক বাক্য ব্যয় করে কোন লাভ নেই। সুবিমলদার আঙুল দিয়ে আজ কিছু বেরিয়ে আসবেনা। টাকাটা না পাওয়া বরঞ্চ সহ্য করা যায়, কিন্তু ঐ হাসি? অসহ্য! উঠে পড়লুম আমি।

সুবিমলদা গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার দেখ্‌ছি টাকাটার খুবই দরকার। কি জানি ভায়া, কেউ চাইলে আমি আমার না বলতে পারিনে। কমপক্ষে কত টাকার প্রয়োজন তোমার?

সংখ্যাটা জানালুম। সুবিমলদা বাক্স খুলে টাকাটা বের করে দিয়ে হেসে বললেন, শুধ্‌ সুপ্রীতির অনুরোধই অন্যের টাকা থেকে তোমাকে এই টাকাটা দিতে হল। নইলে তোমাকে টাকা দেওয়া আর জলে ফেলা একই কথা। ফিরে পাবার আশা নেই।

ক্ষুব্ধ হলুম এ কথায়। সেই শ্বেতশুভ্র অর্থপূর্ণ হাসি। আজ আবার কথাতেই তার সুস্পষ্ট প্রকাশ। টাকাটা ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা হল। পরক্ষণেই ভাবলুম, ঐ হাসিটা বন্ধ করার জন্যই টাকাটা নেওয়া দরকার। প্রয়োজন হলে এর পরেও আর এক দফা এসে হাসিটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। গৃহিনীর দেওয়া সেই অমোঘ অস্ত্রপ্রয়োগ ছাড়া আর অব্যাহতি নেই।

মাসটা এরপর ভালভাবেই কাটল। একদিন চুপি চুপি হোটেলে গিয়ে নিষিদ্ধ পক্ষীর কাট্‌লেটও খেয়ে এলুম। অনভ্যস্ত পেটে ঐ মূল্যবান আহার সহ্য হলনা।

পরদিন মাইনে নেবার তারিখ। অথচ অফিসে যাবার উপায় নেই। ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বাড়ীতেই রইলুম।

টিফিনের সময় হঠাৎ সুবিমলদা এসে পড়লেন। ভাবলুম, টাকার তাগিদে এসেছেন। ভাগ্যিস মাইনে পাইনি তখনও। ওজুহাত দেবার অসুবিধা হবে না।

সুবিমলদা টাকার প্রসঙ্গ তুললেন না। মাইনে না পাওয়ার ব্যাপারটা নিজে থেকে তুলতেই তিনি জানালেন, আমি জানি, তোমার অসুবিধার কথা। টাকা যখন তোমার হাতে আসে তখন দিয়ো। এর জন্য আর ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আমি এসেছি একটা সুখবর দিতে। চাল পাওয়া যাচ্ছে সস্তাদরে। সুপ্রীতিও রাখবে কিছু। সুপ্রীতি বললে তোমাকে জানাতে; ইচ্ছা হলে কিনে রাখতে পার এখন।

পেটের ব্যথাটা যেন বেমালুম সেরে গেল এ কথায়। সুবিমলদা যে দামের কথা বললেন, তা রেশনের দামের চেয়ে সামান্য বেশী। বাজারে এই দামে চাল পাওয়া অসম্ভব। আগ্রহের সঙ্গে বললুম, আমার জন্য মণ চারেক কিনে দিতে হবে সুবিমলদা। কিন্তু সব টাকা এখন দিতে পারব না।

সুবিমলদা গম্ভীর হয়ে বললেন, কত টাকা এখন দিতে পারবে?

অন্তরাল থেকে গৃহিণী ডেকে পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে সুবিমলদাকে বললুম। দুমণের দাম এখন দিতে পারব। বাকী টাকাটা আসছে মাসে দেব।

সুবিমলদা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, সুপ্রীতির অনুরোধ। ঠেলেও ফেলা যায় না। আচ্ছা দাও দেখি, বাকিটা আমাকেই দিতে হবে। আসছে মাসে টাকাটা দিতে যেন ভুল না হয়।

সোৎসাহে বললুম, নিশ্চয়, নিশ্চয়। এত উপকার করলে যে সারাজীবন ধরে একথাটা মনে থাকবে।

সুবিমলদাকে নগদ টাকা দেওয়া গেল না। মাইনেটা সুবিমলদার হাতে দেবার জন্য চিঠি লিখে একটা রসিদ্ দিলুম। অফিস থেকে সুবিমলদা টাকাটা তুলে নেবেন।

বললুম, বাকী টাকাটা আর চাল যেন বিকেলেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় সুবিমলদা। আজ আবার ঘরে চাল বাড়ন্ত।

সুবিমলদা একটু হেসে চলে গেলেন। ওর হাসিটা এমন বিশ্রী লাগে।

সন্ধ্যার সময় একটা ছেলে এসে একখানা চিঠি আর কয়েকটা টাকা দিয়ে গেল। সঙ্গে সের পাঁচেক চালও ছিল। চিঠিটা খুলে পড়লুম। সুবিমলদা লিখেছেন, চাল পাওয়া সম্ভব নয়। রেশনের দোকান ছাড়া আর উপায় নেই। তাই মাইনে থেকে তাঁর দুদফা প্রাপ্য টাকা আর তার সুদ কেটে নিয়ে বাকীটা তিনি ফেরত পাঠালেন। কিছু চালও পাঠিয়েছেন চাল বাড়ন্ত বলে। তার দামটাও তিনি হিসাব মতো রেখে দিয়েছেন।

ভাবছি তাই টাকা কটা ঘটোৎকচের গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়ে আমাশয়ের ব্যথা নিয়েই বিবাগী হব, না আবার শেষরাতে সুপ্রীতির পাশে গিয়ে কিউয়ের ল্যাজে দাঁড়াব!

দুর্গম পথস্তৎ

পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য গৃহিণী রাসলীলা দেখ্‌তে এসেছিলেন।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনী। উৎসবের আয়োজনটাও হয়েছিল ব্যাপক। গৃহিণী বারবার ঘুরে ঘুরে ঔৎসুক্য সহকারে উৎসব দেখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় পাদুটো টনটন করছিল। নিভৃত কুঞ্জবনে একটা চেয়ার দেখতে পেয়ে তাতেই বসে পড়লুম। অদূরে দু'জন চখাচখীর মত বোধ হয় মানবীয় রাসলীলার আলাপন নিয়েই ব্যস্ত। আমাদের অশোভন আগমনে রসভঙ্গে বিরক্ত হয়ে পরোক্ষে একটা কটূক্তি করে তারা উঠে চলে গেল। একে প্রৌঢ় দেহে বাতের প্রকোপটা বেশী, তার উপর পাদুটো-ও এমনি ভারী হয়ে পড়েছে যে কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, তার

উপায়ও নেই। ওদের কটূক্তি তাই অম্লানবদনে মেনে নিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে রইলুম। গৃহিণীও দেখছি উৎসবের শেষটা না দেখে নড়ছেন না।

এক ঝলক চাঁদের আলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের আচ্ছাদন কাটিয়ে সহসা প্রৌঢ় দেহটার উপর এসে পড়ল। মনে মনে একটু হাসলুম। জীবনের রাসলীলার আনন্দময় পরিবেশ অর্থাভাবের মহিমায় ম্লান হয়ে গেছে। মূল্যবান সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, সেটা যেন টের পেয়েও পেলুমনা। তাই এই লোল দেহে মদনশরের ব্যবস্থা কেন ?

গৃহিণীর লুকানো কবি মনটাও যেন আজ ছাড়া পেয়ে বসেছে। হাস্য পরিহাসের লঘু চপলতায় তিনি যেন হারানো মনটার সন্ধান পেয়েছেন।

পুরানো কাহিনীগুলো মনের আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কলেজ পাঠ সমাপনের আগেই সংসারে প্রবেশ ও কলেজ পলায়ন! কত হাসিকান্নার রূপান্তর ভেদ। সেগুলো যেন আজ স্বপ্নায়িত হয়ে পড়েছে। হঠাৎ যেন ঘুম থেকে উঠে তাই দেখতে পেলুম বছরগুলো যেন কোন সংবাদ না দিয়েই গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছে। ফাইল, কালবাজার আর রেশন এই তিনটের চাপে এই দীর্ঘসময়টার যেন কোন হিসাব নিকাশ নাই। পদ্মার খরস্রোত আর অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো দুটো রূপ নিয়ে জীবনটা চলতে চলতে হঠাৎ তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়েই আবার কোথায় তলিয়ে যেত, তার হদিস পেতুমনা। জীবনযাত্রার দুর্গম পথে সে সচকিত ভাব যেন বিদ্যুতের শিখার মত ক্ষণস্থায়ী।

গৃহিণী আজ যেন তাঁর পুরানো বয়স ফিরে পেয়েছেন। চারিদিকে নৃত্য চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করে বেরিয়েছেন তিনি। ইচ্ছা হল, তাঁর মতই বয়সের কথা ভুলে আনন্দে নৃত্যচঞ্চল হয়ে উঠি। কিন্তু বাতের ব্যথাটার জন্যই ইচ্ছাটাকে সংযত রাখতে হল। দেহটা বিরূপ হলেও মনটা ফিরে যেতে চাইল আবার সেই কলেজীযুগে। ঘোমটা পরা নথ দেওয়া মুখখানার কথা মনে পড়ল। ভাবলুম, কত পুরানো যুগের প্রতীক ছিলেন তিনি,

যেন অচল সিকি। কিন্তু বর্তমান যুগের যখন ঘোমটা খোলা আধুনিকার পরিচয় তখন বুঝলুম মাধুর্য্যটুকু যেন আর নাই। সমস্ত সৌন্দর্য্যের উৎসমুখ যেন শুকিয়ে গেছে বয়সটার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। গৃহিণীর রূপ তখন দেখা দিল বাস্তবের দণ্ড নিয়ে, দৃষ্টি ব্যাহত হয়ে ফিরে গেল ফাইল আর টাকার অঙ্কে। জ্যোৎস্না আর টর্চের আলোর তফাৎ রইল না তখন। দীর্ঘদিন পরে জ্যোৎস্নার আলোয় সেই হারানো রূপের সন্ধানে মনটা ঘুরে বেড়াতে লাগল।

গৃহিণী হাঁটুটার উপর চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ভাবছ চুপ করে। চমকে উঠে হাতটা সরিয়ে বললুম্, বাতের ব্যথাটা আবার বেশী হয়ে পড়েছে।

গৃহিণী বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, তোমার সারা গায়েই ব্যথা। কথা বলবার উপায় নেই।

একটু হেসে বললুম্, ব্যথা কি শুধু গায়ে? মনেও! ভাবছি কি জান? আমাদের সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখন ঘোমটায় ঢাকা থাকত তোমার ডাগর দুটো চোখ। টুল টুল করে চেয়ে থাকৃত সে দুটো আমার দিকে; আজ আবার সে দুটো চশমায় ঢাকা পড়েছে। দেখতে পাচ্ছিনে।

কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে বললেন তিনি, রস যে উথলে উঠল দেখতে পাচ্ছি। আমার চোখ দুটোরই উপর বুঝি তোমার নজর ছিল বেশী।

আশ্চর্য্য হবার ভান করে বললুম, বল কি? নিখিল কাব্যের বেটার হাউস যে তোমার ঐ চোখ দুটো।

ভ্রুকুঞ্চিত করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে আবার কি?

জবাব দিলুল, বেটার হাউস বুঝতে পারলে না। গুদাম ঘর আর কি? কেন, কবিতা শোননি, নয়নের মাঝে—

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে তিনি বাধা দিয়ে বললেন, আমার চোখ দুটো বুঝি গুদাম ঘর! কি যে বল তার হুঁস নেই। কবে বলে বসবে কাষ্ঠরেজ ও দুটো।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলুম, কাষ্ঠরেজ! সেটা কি? নাম তো শুনিনি। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন তিনি, আমি কি জানি নাকি ছাই। তোমরাই তো বলো কাষ্ঠরেজ। সেদিন যে বললে ঠাণ্ডা ঘর। যাতে খাবার রাখে।

হেসে বললুম, ওঃ কোল্ড ষ্টোরেজ। নাঃ তোমার চোখ দুটো কোল্ড ষ্টোরেজ হতে যাবে কেন? ওটা হচ্ছে, উষ্ণ প্রস্রবন। মনের খোরাক জমা থাকে সেখানে। উষ্ণতার পরিচয় তো হরদম পেয়ে থাকি।

অভিমানের সুরে তিনি বললেন, আমার সব কথায় দোষ ধরা তোমার অভ্যাস। আমি ছিলুম বলেই এ ভবসাগরটা এতটা ডিঙ্গিয়ে এসেছো, নইলে কোন তলায় যে তলিয়ে যেতে, তার কোন ঠিকানা থাকতনা।

সায় দিয়ে জানালুম, সে কথা ঠিক। তাইতেই তো তোমার কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকতে ভালবাসি। শুধু এই বাতের ব্যথাটার জন্যই হাতটা আর নাড়াচাড়া করতে পারিনে।

গৃহিণী বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, বাত না বাতিক! অকর্ম্মা হয়ে বসে থেকে বাত বাড পেশা কত কি হয়েছে ভেবে লাভ নেই। বারবার করে বলি রোজ বসে কয়লা ভাঙ্গো, বাটনা বাট। তাতো করবেনা! বাত আর বাড পেশায় ভুগবে তার আর আশ্চর্য্য কি? ওসব তো কুড়ে লোকের ব্যারাম।

সহাস্যে জানালুম, এবার থেকে তাই করব ভেবেছি। কলম ছেড়ে যখন পেন্সন নিয়েছি, তখন কয়লা ভেঙ্গেই তেমোর বাত আর বাড পেশা তাড়াব।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, এবার দেখছি, তোমার সুমতি হল।

বললুম, এছাড়া আর উপায় কি? দেখি কয়লা ভেঙ্গেই তোমার মনের দুয়ার খুলতে পারি কিনা।

বিরক্তির ভান করে তিনি বললেন, কি যে বল তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। মনের দুয়ার যেন চিরকালই আটকে থাকে।

রসিকতা করে জানালুম, দরজার কাছ থেকে ইদানীং বারবার ফিরে এসে মনে হচ্ছিল, একটা মরচে পড়া তালা ঝুলছে সেখানে। আমার দুয়ার রুদ্ধ আজিকে। রেশন উঠে না যাওয়া পর্য্যন্ত তালাটা খোলা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা।

গৃহিনী এ কথায় হাসতে লাগলেন। অত্যন্ত মধুর ও মাদকতাপূর্ণ সে হাসি। জ্যোৎস্না প্লাবিত পরিবেশ ও হাসিটাকে পঁয়ত্রিশ বছর পিছনে ঠেলে ফেলে দিল। গলিত নখদন্ত, গলিত কেশ, বাতের ব্যথা আর ব্লাডপ্রেসার যেন মুহূর্তের জন্য অন্তর্হিত হল। ভেসে উঠ্‌ল চোখের সাম্‌নে সেই চিরন্তন যৌবরাজ্য। সেই আদিম মানব ও মানবীর যুগ থেকে বর্ত্তমানের চঞ্চলময় যৌব পরিবেশ। একই রূপে যুগে যুগে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং অনন্তকাল ধরেই ঘট্‌বে। প্রকৃতি দুর্য্যোগময় পরিবেশ আর বর্ত্তমান যুগের কষ্টময় পরিস্থিতির আবিলতায় ভেদ করে সে তার নিজের পথ রচনা করে চলেছে ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর ততোধিক ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে সেই একই ধারা যুগ যুগান্ত ধরে রস সিঞ্চনে একটা মধুর পরিবেশ সৃজন করে আস্‌ছে। জীবন যাত্রা অব্যাহত গতিতে চলে আস্‌ছে আনন্দের তরঙ্গ তরঙ্গায়িত হয়ে। সেই চির চঞ্চলময় জীবন যাত্রার চিরন্তনী প্রকাশ তো সংসারী জীবনের পক্ষে কম নয়। নির্ম্মল নির্মোক আত্মা ছন্দে ছন্দে তালেতালে মহাকালের সঙ্গে নৃত্যায়িত হয়ে ছুটে চলছে আপন মনে। অচ্ছেদ্য, অদাহ্য অমর সে, চির চঞ্চল আনন্দময় তার স্বরূপ। দেশকাল পাত্র তার বাধায় সৃষ্টি করতে পারেনা।

বাধা দিলেন চিন্তা ধারায়। বললেন তিনি, চেয়ে রয়েছ যে অমন করে। তালা বন্ধ দেখে দেখে কিছুই দেখতে পাচ্ছনা বুঝি?

হেসে বললুম, যা দেখ্‌তে চাচ্ছি, তা আর পাচ্ছি কৈ, দৃষ্টিটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে পড়েছে। তাই দেখেও দেখতে পাচ্ছিনে। ভাবছি, কোথায় গেল তোমার সেই ডাগর দুটো চোখ, আনন্দে উছলে পড়ত সেটা। আজ ঘোমটায় ঢাকা নেই তবু দেখতে পাচ্ছিনে।

রসভঙ্গ করে বললেন তিনি, কাল রেশন নেবার তারিখ, মনে আছে তো?

বাস্তবতার ইঙ্গিতে ব্যথিত না হয়ে জানালুম, সেই জন্যই বড়বড় কবিরা বলে থাকেন, কাল কি হবে তাই ভেবে জীবনের সুধার পেয়ালা নষ্ট করোনা। আমার সমস্যা কালের নয়, আজের।

গৃহিণী সোজা হয়ে বললেন, চাকরী জীবনের নানান সমস্যার কথাই এতকাল শুনে আস্‌ছি। পেন্সন নিয়েও সমস্যা ঘুচলনা।

কৌতুকের সঙ্গে বললুম, তোমার ঐ কালো চোখে রক্তিমাভা দেখে দেখে সমস্যাগুলো প্রাঞ্জল হয়েই আসছিল। আজ আবার ঐ কালো চোখ দুটো ফিরে আসায় জটিল সমস্যা এসে ধরা দিচ্ছে।

ঠোঁট দুটোয় মৃদু হাসির আভা ফুটে উঠল তাঁর। বল্‌লেন তিনি, চশমার কাঁচ দুটো বদলে নাও তুমি। ঘোলাটে চোখ দুটো তাহলে পরিষ্কার হবে।

সত্যিই চোখ দুটোয় এই অভিনব পরিবেশে বাস্তবতার নগ্নরূপ আর ধরা পড়ছেনা। কল্পনার রঙিন আলোয় যেন জড়িত হয়ে আস্‌ছে সেটা। ভাবলুম তাই, জীবনের এমনি ধারায় রূপটার পরিচয়ের স্থায়িত্ব যদি ভরপুর হয়ে দেখা দিত। অমাবস্যা আছে বলেই পূর্ণিমার এত আদর। অবশ্য নিরানন্দের মাঝে যাঁরা আনন্দের প্রকৃত রস উপলব্ধি করেন, সংসার জীবনে তাঁর স্থান কতটা সে চিন্তাও এসে মনটায় আলোড়ন জাগাল।

গৃহিণী আমাকে নির্ব্বাক দেখে শুধালেন, রাগ করলে?

প্রত্যুত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলুম, এমনি সময় সেই চখা চখী দুটো আবার হাত ধরাধরি করে অদূরের একটা আসনে উপবেশন করল। চখীর বিরক্তি ভাষণটা কানে ভেসে এল, বুড়োটা এখনও বসে রয়েছে ওখানে। এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই।

চখা হেসে জবাব দিল, শুধু বুড়োটা কেন, বুড়ীটাও রয়েছে যে দেখতে পাচ্ছনা! ওদেরও হৃদয় উথ্‌লে উঠেছে।

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে চখী বললে, কি যে বল তার ঠিক ঠিকানা নেই। বুড়োবুড়ী দুদিন বাদে যাবে গঙ্গার ঘাটে, এখনো ওদের সথ দেখে বাঁচিনে। এখানে এল কেন ওরা মরতে ?

এই মধুর পরিবেশে অবাঞ্ছিত অতিথির ন্যায় থাকতে আর মনটা চাইলনা। নিজেদের মনের দুর্বলতা অন্যের কাছে ধরা পড়ুক এটাও যেন কাম্য মনে হচ্ছিলনা। গৃহিণীকে তাই জানালুম, চল, আমরা অন্যত্র গিয়ে বসি।

ক্রোধ প্রকাশ করে তিনি বললেন, কেন ? এ জায়গা কি ওদের একার নাকি ? যেতে হয় ওরাই যাক। চলাচলি করবার জায়গা পেল না ওরা।

হাসি পেল। প্রেমের দুয়ারে এ দ্বন্দ্ব যেন চিরকালের। জীবনের সুধার পেয়ালা সবাই যেন নিংড়ে নিতে চায়। এরজন্য ব্যস্ততার আর অন্ত নেই। পেয়ালার অংশীদার দেখে নিজের অক্ষমতার পরিচয়ের অভিব্যক্তিতে আরও ব্যস্ত হয়ে আঁকড়ে ধরতে চায়। গৃহিণীর ভিতরে সেই চিরন্তনী বৃত্তির বিকাশ দেখে চুপ করে রইলুম।

মানুষ চায় আনন্দ। সত্যিকারের আনন্দ কিভাবে ধরা দেবে, মানুষ তা জানেনা। কাজেই তাকে খুঁজে বেড়ায়। দেশ কাল পাত্র বয়স এসব আনন্দের পথে বাধা সৃজন করতে পারেনা। পার্থিব আনন্দকেই সব চেয়ে যারা বড় মনে করে, তারা অনেক সময়ে মরীচিকার সন্ধানে ছোটে। মনে হল তাই ভগবতী রাধিকা হ্লাদিকা শক্তির বিকাশ রূপেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জন করছেন। রাসলীলা তারই রস সৃষ্টির দ্যোতক।

চমক ভাঙ্গল চখীর রূঢ় ভাষণে। বললে সে, বুড়োটা ঠায় বসে রয়েছে। কাণ্ডজ্ঞান নেই। উঠবার নামটি পর্য্যন্ত নেই।

চখা আরক্ত নেত্রে বললে, উঠতেই হবে ওর। বুড়োবুড়ীর জন্য এ জায়গা নয়। ওরা পরকালের চিন্তা করে না কেন ? ইহকালের যুগ তো কেটে গেছে ওদের।

মনে পড়ল ইংরাজী একটা কবিতার কথা। প্রাচীন জগৎ নবীনের কাছে স্থান ছেড়ে দিয়ে পরিবর্ত্তনের স্থচনা করে। ইহকালের যুগ আমার সত্যিই ফুরিয়ে এসেছে কিনা জানিনে, কিন্তু নবাগতের দাবীর তুলনায় আমার স্থান যে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে তার প্রমাণ দেবে আমার পক্ক-কেশের শুভ্রতা। পুরানো'কে ঠেলে ফেলে নবীনের এই অভিযানের গতি পক্ককেশের বাঁধনে কত কাল ঠেকিয়ে রাখা যায়। ব্যর্থতার গ্লানি তাই প্রকাশ পায় বাতের ব্যথা আর ব্লাডপ্রেসার প্রভৃতির রূপ নিয়ে।

গৃহিণীকে বললুম, চল আমরা এখান থেকে সরে পড়ি। এদের মধ্যে আর থাকা সমীচীন বোধ হচ্ছে না। গঙ্গার ধারেই যাই চল। সেদিকটা অনেকটা নিরালা পাব।

রোষ কষায়িত লোচনে তিনি জবাব দিলেন, ওদেরই গঙ্গার ঘাটে যেতে বল। দেমাকে আর পা পড়ছেনা। সেদিনের ছেলে, আজ আমাদের দেখাতে এসেছে গঙ্গার ঘাট।

বুঝলুম, গৃহিণীর ব্যথাটা লেগেছে কোথায়! হেসে বললুম, যৌবরাজ্যে প্রৌঢ়দের স্থান চিরদিনই ওরা আপত্তিজনক মনে করে। জীবনের পেয়ালাটাকে অভিজ্ঞতার আস্বাদে ওরা বোধ হয় নষ্ট হতে দিতে চায় না।

বিরক্তি প্রকাশ করে বল্লেন তিনি, তোমার কাব্য এখন রাখ। ছুঁড়ীটার দেমাক দেখলে পিত্ত জ্বলে যায়। ঢলাঢলির জায়গা পেলনা। নিমতলার ঘাটে যাকনা ওরা।

স্বরটা নেহাৎ মৃদু নয়। তীক্ষ্ণতার বহর দেখে মনটা বেশ সশঙ্কিত হয়ে উঠল। গৃহিণী যেমন মারমুখী হয়ে উঠেছেন, এই নিয়ে একটা হাঙ্গামা হওয়াও বিচিত্র নয়। এই সুন্দর পরিবেশটার মাধুর্য্য এমনি ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে এ কল্পনাও কেমন যেন অস্বস্তির ভাব জানিয়ে দিল।

চখাটির কানে বোধ হয় কথাগুলি ভালভাবেই ঢুকেছিল। উক্তার পরিচয়েই সেটা প্রকাশ পেল। এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণস্বরে গৃহিণীকে প্রশ্ন করল, কি বলতে চান আপনি?

গৃহিণী ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার মাথা আর মুণ্ড।

প্রত্যুত্তরে চখা আরক্ত নেত্রে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমনি সময় জনৈক কন্ঠীধারী বাবাজী টুং টুং করে একতারা বাজাতে বাজাতে চখীর পাশে এসে বসে চখীর দিকে নির্মিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার সর্বাঙ্গে তিলক কাটা। মাথার পিছনে স্থূল কেশগুচ্ছ। বাকী সব চুল নির্মূল করে কেটে ফেলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এক বৈষ্ণবীও এসে জুটল। চখী ও বাবাজীর মাঝটায় সে সজোরে আসন নিয়ে বসল। বাবাজীটা এক হতাশার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে উঠল, জয় রাধে।

বুঝলুম, এরা রাসলীলার পরম ভক্ত। স্থান কাল পাত্রের ভেদাভেদ রাখবে কিনা বলা শক্ত।

চখী উঠে দাঁড়াল। রাগের মাথায় কি সব বলল, কিছুই বোঝা গেল না। চখা তার দিকে এগিয়ে গেল। চখী তাকে জানাল, চল, আমরা এখান থেকে যাই।

আর একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উভয়েই সেখান থেকে বিদায় নিল।

বুঝলুম, মাৎস্যন্যায় নীতির ফলেই অনেক অসমব্যবস্থা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। গৃহিণীও পরিস্থিতিতে আশ্বস্তা হয়ে জানালেন, বেশ হয়েছে। যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর।

পরিহাসের সুরে জানালুম, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথায় ধরা দেয় কে জানে?

গৃহিণী বিরক্ত হয়ে বললেন, সেই বলে গুরু লঘু জ্ঞান নেই। আমার কাছে এসেছিল যেন মারমুখী হয়ে। আপদ কোথাকার।

বাবাজী একতারাটি একান্তে রেখে রুক্ষস্বরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বুড়োবাবাজীর আখড়াটা কোথায়?

উত্তর দেব কিনা ভাবছি। গৃহিণী মুখমণ্ডল কুঞ্চিত করে বললেন, এ মিনসেটা বলে কিগো? তোমাকে শেষটায় আখড়ার বোষ্টম বানিয়ে ফেলল। নাও এখন তিলক ফোঁটা কাট। একটা গেল তো আর একটা এসে জুটল। নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বসবার জো নেই।

মুখমণ্ডলে একবার হাতটা বুলিয়ে বললুম, আমাদের উপস্থিতিটা ওদের মনঃপূত হচ্ছে না। তাই হয়ত সমশ্রেণীর পর্য্যায়ে আনতে চায়।

ঠাট্টার সুরে তিনি বললেন, ভিড়ে পড় ওদের দলে। তিলক ফোঁটা, কাটতে আরম্ভ কর। তোমার আবার সবতাতেই মাথা গলানো অভ্যাস।

রুক্ষস্বরে আবার প্রশ্ন হল, কথাটা বুঝি কানে ঢোকেনি? বিরক্তির সুরে বললুম, যার তার কথা কানে নেবার ইচ্ছা আমার নেই। আখড়াও আমার নেই, বাবাজীও সাজতে চাইনে।

একতারাটি হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিক তাকিয়ে রূঢ় কণ্ঠে সে বলে উঠল, তাহলে হঠাৎ এই কুঞ্জবনে আসার হেতুটা কি?

গৃহিণী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, আ মলো! এই বোরেগীটা কি বলতে চায় গো। এটাকে তাড়িয়ে দাও না এখান থেকে।

বৈষ্ণব সহচরীটি উঠে এল। একতারাটি মাথার উপর তুলে বাবাজীটি কি যেন বলতে চাচ্ছিল, সহচরী তাতে বাধা দিয়ে বলে উঠল, কি করা হবে শুনি? বাড়ী কোথায় জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তাই মান খসে পড়ল। বোষ্টম বাবাজীর সঙ্গে আবার ঝগড়া করা হচ্ছে।

বাবাজীও সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল চেঁচাতে লাগল। ওদের ক্রোধ মিশ্রিত ভাষণের অর্দ্ধেক কথাই বোঝা গেল না। তবে যেটুকু কানে এল, তাতে রক্তের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবার কথা। বাতের ব্যথাটাও যেন ঘটনা চক্রে কমে এল। হাতের লাঠিটা নিয়ে একতারার সম্মুখীন হলুম।

সহচরী ব্যঙ্গকরে উঠল, ইস, মারামারি করতে এয়েছেন। লাটির ভয়ে বোষ্টম পরভূ কাবু নয়। বাবাজী ঝগড়া ঝাটী ভাল বাসে না। নইলে দিতো একতারাটি মাথার উপর বসিয়ে।

বাবাজীও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, রাসলীলার এই কুঞ্জবনে বোষ্টম ছাড়া আর কারও অধিকার নেই।

ওদের চেঁচামেচিতে লোকজন ছুটে গেল অনেক! প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় এসে একজন অকেজো বাবাজীর সঙ্গে কোন্দল করতে পৌরুষের কাজ বলে মনে হল না। কিন্তু ওদের অশোভন উক্তিগুলোও বরদাস্ত করা কঠিন। এই সুন্দর মনোমুগ্ধকর পরিবেশটাকে ওরা একটা হীন কোন্দলের আবহাওয়ায় বিষাক্ত করে দিল। প্রেমের পথটা যে মসৃণ নয়, এ যেন তারই একটা পরিচিতি।

জনতার মধ্য থেকে কেউ কেউ বাবাজীকে উৎসাহিত করে তুলছিল। দূর থেকে বাবাজীর আস্ফালনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

গৃহিণী সহসা বলে উঠলেন, এত জাঁদরেল সাহেব সুবো তোমার বন্ধু! আর তুমি একটা তুচ্ছ বোরেগীর অত্যাচার সহ্য করছ। একটা খবর পাঠালেই তো এদের কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে। নিজের ক্ষমতাও তো জাহির করতে পার। ডাকনা তোমার কনেষ্টবলদের। দুঘা কসে লাগাক্।

একতারাটি হাতে বাবাজীটি সহসা পিছিয়ে গেল। সহচরীটি তার পশ্চাতে আশ্রয় নিল। বাবাজী বৈষ্ণব জনোচিত সুললিত বচন বিন্যাস করে বলে উঠল, মহা অপরাধ হয়েছে। এবারটি মাপ করুন। আপনি পুলিশের লোক, জানতুম না।

সাক্ষী হবার ভয়ে জনতাও নিমেষে উধাও হয়ে গেল। বাবাজীর তখন কম্পমান অবস্থা। গৃহিণী মুখে অঞ্চল দিয়ে চাপা হাসি হাসতে লাগলেন।

আমি শুধু নির্ব্বাক হয়ে গৃহিণীর বাক্‌ চাতুর্য্যের ফলাফল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে লাগলুম। গৃহিণীর মিথ্যা ভাষণের প্রতিকারও করা হল না।

বাবাজী সভয়ে একতারাটি ফেলেই সহচরীকে সঙ্গে করে দ্রুতপদে চলে গেল।

গৃহিণী উপবেশন করে আমাকে ভৎর্সনা করে বললেন, তুমি কি হাঙ্গাম বাধিয়েছিলে বলত? চিরকালই কি গুণ্ডামী করে কাটাবে? ভাগ্যিস তোমাকে পুলিশ বানালুম, তাই রক্ষে।

বললুম, আর এখানে নয়। চল আমরা গঙ্গার ধারটা ঘুরে বাড়ী ফিরে যাই।

গৃহিণী আপত্তি জানিয়ে বললেন, বসনা, আর একটু। এখন আর সহসা কেউ আসছে না।

উপবেশন করে বললুম, আজ জ্যোৎস্নাটা এখন খুব ভাল ভাবেই ফুটে উঠেছে, নয়?

অন্যমনস্কতার সঙ্গে তিনি বললেন, ঐ বাবাজীটা বড় ঝগড়াটে, তাই না?

লতা পাতা ঘেরা বনটায় আলো ছায়া যেন লুকোচুরি খেলছিল। মৃদু মন্দ বাতাসে দোল দেবার ফলে আলোর তরঙ্গগুলো দুলে উঠে সৌন্দর্য্যময় পরিবেশ সৃজন করছিল। গৃহিণীর হাতে ব্যথাপীড়িত হাত খানা রেখে বললুম, সংসারের ভালমন্দের মধ্যে যে প্রেমের চিত্র গড়ে ওঠে তার নায়ক নায়িকা হবার যোগ্যতা আমাদের আছে কিনা জানিনে। তবে আজ এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে বারবার মনে হচ্ছে, তুমি ও আমি কত নিকটে আবার এসে পড়েছি।

গৃহিণী জানুর উপর চাপ দিয়ে বললেন, আজ যে তুমি কবি হতে চললে। কথাগুলোও দেখছি রসে টই টম্বুর।

হাতটা তুলে নিয়ে বললুম, সে রসের মূল উৎস—

কথাটা আর শেষ করতে পারলুম না। দেখি, মঠের কর্তৃপক্ষ কয়েকজন এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।

গৃহিণী সচকিতে সরে গেলেন। কর্তৃপক্ষ সবিনয়ে প্রসাদ গ্রহণে নিমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রণের কারণের মূলসূত্রটি অনুমান করতে আমার বিলম্ব হল না। আমিও ততোধিক সবিনয়ে শারীরিক অক্ষমতা জানিয়ে বিদায় নিলুম।

একটা ট্যাক্সি করেই বাসায় ফিরলুম। জীবনের একটা মধুর দিনে কার্পণ্য করতে মনটা যেন সায় দিতে চাচ্ছিল না।

পঞ্চাশোর্দ্ধে

পঞ্চাশ বছর পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই নোটীশ পড়তে লাগল সর্বদিক থেকেই। নানা রকম প্রচেষ্টা সত্বেও এড়াবার কোন পথ পাওয়া যায়না। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে নানান জিনিষের আবির্ভাব হয়ে বয়সটার কথা যেন বারবার জানিয়ে দেয়। চুল চোখ দাঁতেই এর বহিঃপ্রকাশ বেশী। অন্তরে কলকব্জাগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। ইঞ্জিন আর ভাল মত চলতে চায়না।

পরিস্থিতিটা আবার গৃহিণী ভাল ভাবেই স্মরণ করিয়ে দিয়ে একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হবার উপদেশ দিলেন। ইঞ্জিন হঠাৎ একবার কয়েক সেকেণ্ডের জন্যও বন্ধ হলে, আর চালাবার উপায় থাকবেনা।

আরসীতে নিজের মুখটা একবার দেখে নিলুম। তাইত, নোটিশতো একটা নয়, অনেকগুলো জারী হয়েছে মুখের নোটিশ-বোর্ডে। ধরণী আর ধরে রাখতে চায় না, তাই ছোট খাট নোটিশ চাপিয়েছে। এর পর উচ্ছেদের নোটিশ কবে এসে পড়তে পারে কে জানে।

সংসার চরিতম্‌

অবশেষে সর্ব্বরোগহর শ্রীধরদার শরণাপন্ন হলুম। শ্রীধরদা ডাক্তারী করেন। বিশেষজ্ঞ নন তিনি, কাজেই পায়ের নখ থেকে মাথার চুলের ডগায় চিকিৎসা তাঁর করতে হয়। আমাকে উল্টে পালটে পরীক্ষা করে তিনি রায় দিলেন। চিন্তার কোন কারণ নেই। দাঁত কটা তুলে বাঁধিয়ে দিচ্ছি, চুলে একটা কলপ লাগাও। তা হলেই মেকী যৌবরাজ্যে ফিরে যাবে। চোখটা অবশ্য একটু ভোগাবে। চশমা নাও, তবে চিকিৎসা কিছুদিন করা দরকার। ভেতরের ইঞ্জিনটা মরচে পড়েছে, ঘসে মেজে নিলে আর কিছু দিন চলবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সভয়ে বললুম, গায়ের চামড়াটা যে ক্রমশঃ ঢিলে হয়ে আসছে শ্রীধরদা। ওটাকে টাইট করা যায় না?

শ্রীধরদা পরিহাসের সুরে বললেন, পূর্ব্ব পুরুষদের উপর-ভক্তি আছে তো?

উত্তর দিলুম, তা আর থাক্‌বে না, বিলক্ষণ আছে।

তিনি সাহস যুগিয়ে বললেন, তবে আর কোন চিন্তা নেই। গোটা কতক পূর্ব্ব পুরুষ জোগাড় করে ফেল। রামানুচর জীব। এন্তার সব বসে আছে গাছের ডালে ডালে। ওরই গ্ল্যাণ্ড থেকে ওষুধ তৈরী করে ইনজেকশন করে দেব। চামড়া তো টাইট হবে, ইচ্ছে করলে গাছে গাছে লাফিয়েও বেড়াতে পারবে।

হেসে বললুম, গৃহিণী রামায়ণ পড়েন, রামানুচর জীবদের উপরও তাঁর ভক্তি অগাধ। কিন্তু সেটা ঐ বইয়ে। তোমার ইনজেকশন নিয়ে এহেন যৌবরাজ্যে পদার্পন করলে গৃহিণী লাঠি নিয়ে তাড়া করবেন, একথা হলফ্‌ করে বল্‌তে পারা যায়।

ষ্টেথেসকোপটা ঠক্‌ করে টেবিলের উপর রেখে শ্রীধরদা ঠাট্টা করে বললেন, তা হলে ভোগো পঞ্চাশটা ব্যারামে। পাইওরিয়া মাইওরিয়া তো তোমার অঙ্গের ভূষণ। এরপর দেখা দেবে ডায়েরিয়া, ঐ ছত্রিশফুট

নাড়ীগুলোর মধ্যে দেখা দেবে প্রচণ্ড ঘা। তারপর একদিন সবটা কেটে বাদ দিলে, বাস, খাওয়া দাওয়া বন্ধ।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললুম, তাহলে তো বাঁচা যায় শ্রীধরদা। রেশন আনা যা হাঙ্গামা।

শ্রীধরদা হাসতে হাসতে বললেন, তা ঠিক, তবে অন্য উপায়ে টিকতে হচ্ছে দরকার তোমার চুলে কলপ, পেটে পাচন, দাঁতে সাঁড়াশী, চোখে ঠুলি, আর মগজে বাতের তেল।

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, বাতের তেল?

শ্রীধরদা হেসে বললেন, হঁ, ওটা অনেক চিন্তা করার দরুন ব্যাথায় ভরে আছে, মালিশ দরকার।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম্।

উঠে পড়লে যে? বল্লেন তিনি, আমার কথা তো এখনও শেষ হয়নি।

হতাশার ভান করে বললুম, এ সব শোনার পরও যে এখন পর্য্যন্ত টিকে আছি, ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি। বাড়ী পর্য্যন্ত ফেরা যাবে তো?

শ্রীধরদা মাথা নেড়ে বললেন, ভরসা নেই। বড় ঘর-কুনো হয়ে পড়েছ। তোমার দেখা পাওয়াই ভার। চা তৈরী হচ্ছে। এক কাপ কড়া চা খেয়ে যাও। বাঁহা বায়ান্ন তাঁহা তেপ্পান্ন। পাকস্থলীটা আরও বেশ কিছু নাড়াচাড়া দিয়ে দাও। দাঁতগুলো টপ টপ পড়ে যাবে; সাঁড়াশীর দরকার হবে না। মাথার চুল যা উঠ্ছে এখন, তাতে চিন্তার কারণ নেই। অচিরেই মরুভূমির খেজুর গাছ হয়ে যাবে। কলপের দরকার হবে না।

শ্রীধরদার বন্ধুত্বের দাবী অবহেলা করা চলে না। কাজেই এক কাপ কড়া চা খেয়ে উঠ্তে হল।

অফিসে গিয়েও নিস্তার নেই! সবে মাত্র ফাইল খুলেছি, আরদালী এসে জানাল, বড় সাহেব ডাক্ছেন, জরুরী।

বড়সাহেব ! বিশেষ কাজ না থাকলে তো তিনি ডাকেন না। ব্রস্তব্যস্তে উঠলুম। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হাতের ফাইলের ধাককায় দোয়াতটা উল্টে সারা টেবিলটায় কালি পড়ে গেল। টেবিলের উপরের কাগজ পত্রে আর আমার জামায় খানিকটা লেগে গেল। আরদালীকে কালিটা মুছে ফেলতে বলে শশব্যস্তে বড়সাহেবের টেবিলের সাম্‌নে এসে হাজির হলুম। ধোপ দুরস্ত জামাটায় কালির ছিটে পড়ায় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

গম্ভীর হয়ে বড় সাহেব বললেন, হয় চশমা, না হয় পেন্সন নাও, বাবু। তোমার কাজের প্রশংসা করি সত্য, কিন্তু দৃষ্টিহীনতার নিন্দা না করে থাকৃতে পারিনে। ছোট সাহেব তোমাকে বিদায় করবার সুপারিশ করেছেন।

নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বড়সাহেব বলতে লাগলেন, একলক্ষ টাকা মঞ্জুরীর জন্য লিখতে বলা হয়েছিল। তোমার হাতে পড়ে সেটা দাঁড়িয়েছে দশহাজারে। ভাল করে দেখে শুনে কেস পাঠাতে হয়।

চিঠি পড়ে দেখলুম, একটা শূন্যের গণ্ডগোল হয়েছে।

বড়সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, এরকম যেন আর না হয়। সাবধান করে দিলুম।

শুষ্ক মুখে ফিরলুম। বাড়তি শূন্যটা আমার চোখের সাম্‌নে বৃহৎ একটা বর্তুলাকারে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভাল করে নিশ্বাস নেবার জন্য জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। দৃষ্টিহীনতার নিদর্শন কিনা জানিনে, বাইরের উন্মুক্ত আকাশে সারা সৌর জগৎটাই যেন বনবন করে ঘোরা আরম্ভ করল আমার চোখের সামনে। সমস্ত জগৎটাই যেন বিরাট শূন্যের একটা গোলক হয়ে আমার কাছে ধরা দিল। দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে রুমালটা দিয়ে চোখটা আবার ভাল করে রগড়ে নিয়ে নিজের চেয়ারটায় এসে বসলুম।

করালীদা লেজারে অঙ্কের হিসাব মিল করছিলেন। দন্তহীন মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বের হচ্ছিল। আমার অবস্থা দেখে সহানুভূতির সুরে বললেন, ভায়া, এত তুক্ষীভাব কেন? বড়সাহেব কি বললেন? আমার উপর তো বেজায় চটা। আমার কথা কিছু বলল নাকি?

করালীদ'র ধারণা চারিদিকে নিত্যই তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। আরদালী থেকে বড়সাহেব পর্য্যন্ত সব সময়ে তাঁর আলোচনা নিয়েই ব্যস্ত। গোপনে আলোচনা শোনারও বেশ একটা বাতিক তাঁর আছে।

অন্য সময় হলে তাঁকে নিয়ে রহস্য করা চলত। মনটা আজ বেশ ভালভাবেই বিক্ষিপ্ত আছে তাই সংক্ষেপে বললুম, ওসব কিছু নয় দাদা, দু'দশ টাকার তফাৎ হয়েছে তাই।

করালীদা মুখব্যাদান করে বললেন, একটা আঁক দশবার দেখে লিখি, দশ দশ বার যোগ করে মিলিয়ে দিই। তফাৎ হবার কোন উপায় নেই। এতে বড় সাহেব কি করে ভুল—

বিরক্তি প্রকাশ করে বললুম, তোমার কথা বলছিনে, এ আমার নিজের কথা। আমার হয়েছে ভুল। শূন্যে গোল হয়েছে।

করালীদা তৎক্ষণাৎ বললেন, শূন্য তো গোলই, তাতে আবার গোল লিখে দাওনি বুঝি?

বিরক্ত ভাবেই বললুম, একটা শূন্যেই নব্বই হাজারের গলতি। বড় সাহেব জানালেন, হয় ঘাটতি পূরণ করতে হবে, নয় চশমা নিতে হবে, নইলে অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা অচিরেই নেবেন।

করালীদা সহানুভূতির সুরে বললেন, তাহলে ঐ ত্রিশেই রফা করে ফেলো ভায়া। চশমা একটা ওতেই হবে। চাকুরীটা আর খুইয়োনা। যে মাগ্যি গণ্ডাব বাজার।

ভ্রুকুটী করে বললুম, কোনটা সামাল দিই, বলতো। শুধু চশমা নিলেও চলছে না। দাঁতও তুলতে হবে, বাঁধানোও দরকার। সব দাঁতগুলো

যেন পেণ্ডুলাম হয়ে উঠেছে। আবার চুলগুলোতেও বরফ জমছে। বড়সাহেবের দৃষ্টি কোনটাতেই কম পড়ে না।

করালীদা সংশয়িত হয়ে বললেন, তাইতো ?

হতাশ হয়ে জানালুম, অথচ অর্থটা অপ্রতুল। পেন্সনটাই নিতে হল করালীদা ! উপায় নেই।

করালীদা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, কি মুস্কিল।

তেমনি ভাবে বললুম, মুস্কিল বলে মুস্কিল। দেখছ তো এই চেক বইটায় কত কালি পড়েছে। দোয়াতটা তাড়াতাড়িতে উল্টে গিয়ে এই কাণ্ড। কিম্ভুত কিমাকার কালিমাখা জামাটা নিয়ে গিয়েই তো চাকরী যাবার উপক্রম। এখন এই কালিমাখা চেক বই তার সামনে গেলে পেন্সনের ব্যবস্থাটাও যে ভণ্ডুল হয়ে যাবে। এখন মানে মানে পেন্সনটা পেলে হয়।

করালীদা মাথা চুলকিয়ে বললেন, তাই তো ভায়া, অবস্থাটা সঙ্গীন করে তুলেছো দেখছি। বড়সাহেব অবশ্য তোমার কাজের তারিফ করেন। এ কারবারটা বড় হবার মূলেও রয়েছো তুমি। সে কথা বড় সাহেব তো অস্বীকার করেন না। কিন্তু ইদানীং দেখছি বড়সাহেব বেজায় চটে গেছেন।

বিমর্ষ হয়ে বললুম, শান্ত লোক রেগে উঠলে, আর রক্ষা নেই। বড়সাহেব আজ প্রকারান্তরে জবাব দিয়েই দিলেন। ভাবছি তাই, আরও চাকরীর মায়া করে আঁকড়ে থাকলে পেন্সনটাও জুটবে না। সেদিন কথায় কথায় মাইনেটায় খরচ কুলিয়ে উঠতে পারছিনে, জানিয়ে ছিলুম। তার পরই দেখছি সাহেব ক্রমশঃ খাপ্পা হয়ে উঠছেন। বড়সাহেবের কাছে আর বড় এগোয়নি কিন্তু ছোট সাহেব তো আমার উপর অগ্নিশর্মা। আমাকে বিদায় করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

করালীদা চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, বল কি ?

গম্ভীর হয়ে বললুম্ হুঁ। চাক্‌রীটা তো গেলই। বড় সাহেব রাখলে ত ছোট সাহেব সহজে ছেড়ে দেবেন না। সুতরাং মানে মানে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

করালীদা মাথা চুলকাতে লাগলেন। আমিও এই অবসরে একখানি ইস্তফা-পত্র লিখে পেন্সনের প্রার্থনা জানিয়ে দরখাস্তখানি করালীদার হাতে দিয়ে বললুম, একটা উপকার করতে হবে দাদা। চিঠিখানি অফিস ছুটির পর একবার বড় সাহেবের টেবিলের উপর রেখে আস্‌তে হবে। নিজে না পারো, আরদালীর মারফৎ পাঠিয়ে দিয়ো, আমি চললুম।

করালীদা বিমর্ষভাবে বললেন, তাইতো ভায়া, চাক্‌রীটা ছেড়ে দেওয়াই কি ভাল হল ?

গম্ভীর হয়ে জানালুম, উপায় নেই, করালীদা।

অফিস থেকে বের হলুম। করালীদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিদায় দিলেন।

বাড়ীতে পৌঁছেও বেশীক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা গেল না। গৃহিণীর পীড়াপীড়িতে ঘটনার কথা খুলে বলতেই তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, বড়সাহেব বললেন, আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে চাকুরীটা ছেড়ে দিয়ে এলে। বড়সাহেব যদি বলতেন, তুমি ঘাস খাও, তাহলে পারতে ?

সভয়ে জানালুম, বড়সাহেব প্রায়ই এ কথাটা বলেন বটে, তবে আমি পারি কিনা, সে হচ্ছে আলাদা কথা। জিনিষপত্রের দাম বেশী হবার ফলে, বাজারে যে সব শাক এসে সেদ্ধ হয়ে পাতে দেখা দেয়, সেগুলোর মধ্যে প্রচুর ভিটামিন থাক্‌লেও ঘাসের পর্য্যায়ে পড়ে কিনা জানি না।

গৃহিণী রাগতস্বরে বললেন, মাথায় তোমার শুধু গোবর! এদিকে কথায় বৃহস্পতি। চাক্‌রী তো ছাড়লে, নাও এখন কথা বেচে খাও। ওকালতি কর গে।

সবিনয়ে জানালুম, ওতে একটা বিদ্যার ছাপ লাগে। সেটা আমার নেই। এখন বয়স হয়েছে, তাই পেন্সন নিয়ে বিশ্রাম—

সংসার চরিত্তম্

গৃহিণী সহসা গৃহান্তর থেকে একপ্রস্থ বিছানা বয়ে নিয়ে জানালেন, নাও এখন শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নাও। কি যে দুর্মতি!

অঞ্চলটা চোখের উপর রেখে তিনি গৃহান্তরে চলে গেলেন। বর্ষণটা হল কিনা জানতে পারলুম না।

এই জটিল পরিস্থিতিতে বিশ্রামের আয়োজনটা সুখকর মনে হল না। ঘণ্টা দুয়েক গরম আর দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। গৃহিণীও ক্রোধেই হোক আর ক্ষোভেই হোক, সেই যে গেলেন, আর দেখাও দিলেন না।

সন্ধ্যার সময় ধূর্জটিদার সন্ধানে বের হলুম। পাকা দাবা খেলোয়াড় তিনি। আমার সংসার জীবনে দাবাটা ঠিক মত খেলছে কিনা, এটা তাঁর কাছ থেকে জানা দরকার।

ধূর্জটিদা মনোযোগ সহকারে আদ্যোপান্ত ঘটনাটা শুনলেন। গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করলেন, কাজটা তো ভাল হয়নি ভায়া। দরখাস্তটা ফিরিয়ে নেবার উপায় থাকলে তাই করো। গোড়াতেই মন্ত্রী হারিয়ে ফেললে খেলাটা গোলমাল হয়ে যায়। অবশ্য রাজাকে আড়াই চালে কাবু করতে পারলে কিস্তিমাৎ।

দাবা খেলাটা ভাল জানা ছিল না। দুঃখিত হয়ে বললুম, যদি ফেরৎ না দেয়। ছোট সাহেব তো মারমুখী হয়ে রয়েছেনই। এতক্ষণ হয়ত ব্যবস্থা হয়েই গেছে। চশমাটা নিলেই বুঝি ভাল হত?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ বয়সে দৃষ্টিটা একটু ঘোলাটে থাকাই ভাল ভায়া। চশমা নিয়ে গৃহিণীর যা রূপ চোখের সামনে ফুটে উঠবে। তাতে কি আর মন উঠবে। যে বয়সের যে ধারা। দাবা খেলায় আসরে এসে জমাট বাঁধো। তাহলেই দিব্যদৃষ্টিটা খুলে যাবে। একটা রাজত্বের ভার এসে পড়বে। দিনরাতগুলোও সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধের নেশায় কেমনভাবে কেটে যাবে, টেরও পাবে না। গৃহিণীর বকুনি পর্য্যন্ত কানের আশে পাশেও ঘেঁষতে পারবে না, আর বড় সাহেব? অন্তে পরে কা কথা?

দাবার মহিমা জানবার জন্য তেমন ব্যস্ত ছিলুম না। পদত্যাগ পত্রটা ঝোঁকের বশে জমা দেওয়াটা ভাল করিনি বলে বার বার মনে আঘাত হানল। গৃহিণীর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপগুলো বার বার কানের মধ্যে গুঞ্জন তুলছিল। ছোট সাহেবের যা আক্রোশ! এতক্ষণে দরখাস্তখানার শেষকৃত্য নিশ্চয় ঘটে গেছে। ছোট সাহেবের গাফিলতির পরিচিতি দু একটা বড় সাহেবের কাছে তুলে ধরতেই এই বিপত্তিটা ঘটল। আর না তুলেই বা উপায় কি? নিমক খেয়ে আর নিমকহারামী করা চলে না। অথচ বড় সাহেবেরও যা ভ্রুকুটী!

ধূর্জ্জটিদা সিগারেট টানছিলেন। আমাকে নিরুত্তর দেখে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, নান্যোব গতিরন্যথা। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে অনেকদিন, এখন বিদায় নেবার পালায় গম্ভীর হলে চলে। বনং ব্রজেৎ আজকাল চলে না। কালটা কলিকাল এবং বন বিভাগও বনে ঢুকতে দিতে নারাজ। নইলে হরিণ শিকার করে সংসার চালানো যেত। এখন একটা পাতা ছিঁড়লে হয়। একদম শ্রীঘর।

কথাগুলো ভাল করে কানে ঢুকছিল না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললুম, তাহলে কি করা যায়? একটা পরামর্শের জন্য এলুম, আর তুমি—

ধূর্জ্জটিদা হেসে বললেন, পরামর্শটা মনঃপুত হচ্ছে না কেমন? এই নয়া রাজ্যে ঢুকে পড় এখন। নৌকা, গজ, ঘোড়া মন্ত্রী কিছুরই অভাব নেই এতে। দস্তুর মতো ব্যূহরচনা করে এগিয়ে যাবে, পররাজ্যে। এখানে ছোট সাহেব বড় সাহেবের পাত্তা নেই। আছে যুদ্ধ জয়, কিস্তিমাৎ।

বিরক্তি প্রকাশ করে বললুম, কিন্তু গৃহিণী যে এ কিস্তিমাৎ মেনে নেবেন না। তাঁর দরকার চাল, ডাল, দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিষ। পেন্সনে সেটা কুলোয় না। যা কাল বৈশাখীর নর্ত্তন হয়ে গেছে। বাড়ী গিয়েই তো দেখতে পাব বর্ষার প্লাবন আর মেঘের গর্জ্জন।

ধূর্জ্জটিদা গম্ভীর হয়ে বললেন, বড় সমস্যায় ফেললে হে। মন্ত্রীহীন অবস্থায় পাকা খেলোয়াড় ছাড়া খেলা চলে না। তুমি তো আনকোরা। নয়া রাজ্যে

থেঁই পাবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ লোটা কম্বল সম্বল করে তার্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াও। পরকালের কাজ হবে। আর যদি ঐ সঙ্গে ইহকালের ব্যবস্থাটাও করতে চাও, চুলে জট পাকিয়ে হাত দেখবার ফাঁকিটা শিখে নাও। ঐ সঙ্গে যদি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী বলতে পার ; তাহলে মধুরেন সমাপয়েৎ।

শির সঞ্চালন করে বললুম, পথটা বড় মসৃন মনে হচ্ছেনা দাদা। এমনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে গৃহিণীর মধুর বাণী না শুন্‌লে ঘুমটাও যেন আসেনা। তাছাড়া ঐ উকুন জিনসটা আমি মোটেই সহ্য করতে পারিনা।

ধূর্জ্জটিদা দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বললেন, জিতারহো বেটা! ইহকালে বড়সাহেব আর পরকালে যমদূত কেউ আর তোমার পাশে ঘেঁষতে সাহস পাবেনা। সহিষ্ণুতার অগ্রদূত তুমি। সুতরাং দরখাস্তটা যদি ফেরৎ নিতেও না পারো, তবে আর একটা দরখাস্তের মহিমায় তোমার অফিস অথবা অন্য অফিসের ফাইলের মধ্যে ডুবে যাও। আর সেটাও যদিনা পার, তাহলে তোমার সম্বল রইল, কয়লা—

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম কয়লা!

ধূর্জ্জটিদা মোলায়েম হাসি হেসে বললেন, কালো আর কয়লা দুটোর মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। দুটোই অন্ধকারের সামিল, বাজার দুটোই তাই একই রকম। ওজনে কম দেওয়াই রেওয়াজ। তাছাড়া সময় বুঝে কোপ। জানতো এ দ্রব্যটা কিউ করে কিনতে হয় সের হিসাবে আজকাল।

বললুম, ঐ দুষ্প্রাপ্য জিনসটা সের হিসাবেই যখন অন্দর মহল পর্য্যন্ত যথা সময়ে পৌছে দেবার জন্য হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে টনে টনে পাবার স্বপ্নটাও যে দুরাশা।

ধূর্জ্জটিদা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে কয়লার মহিমা কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। রাত্রির অন্ধকার দেখা দিল। আমিও বিদায় নিয়ে উঠলুম।

সাহেব পাড়া দিয়ে ট্রামটা চলছিল। দূর থেকে বড় সাহেবের নিবাসটা দেখা গেল। চলন্ত ট্রাম থেকেই লাফ্ দিয়ে নেমে পড়লুম। অন্যমনস্ক

ভাবে চলতে লাগলুম। বড়সাহেবের গেটটা সাম্‌নেই। কিসের আকর্ষণে সেই দি.কই চলতে লাগলুম। মনে হল একবার, কাজ নেই, ফিরে যাই। ভেসে উঠল, গৃহিণীর বিদ্রূপোক্তি, চাপা অশ্রুসজল মুখ, চাল ডাল লবণ তেলের হিসাব আর দাবার চাল। হঠাৎ একজন লোকের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লেগে গেল। কেমন যেন আবছা অন্ধকারে ঢাকা সে জায়গা। গেটের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছিল সে। চমকে উঠলুম, বড়সাহেবের সঙ্গে ধাকা লাগেনি তো?

একটা ধমকের সুর কানে ভেসে এল, তাজ্জব কা বাত! অন্ধা তোম্।

চেয়ে দেখি রামপ্রসাদ। বড়সাহেবের খাস পিওন। চাকুরীর ধাক্কায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ছাতু খাবার পয়সা পর্য্যন্ত ছিলনা ওর কাছে। বড়সাহেবকে সুপারিশ করে আমিই ওকে আফিসের পিওন করে নিয়েছিলুম। এখন হয়েছে খাস পিওন। বড়সাহেবের পেয়ারের ধন।

পরিচয় জানিয়ে ঔৎসুক্যের সঙ্গে বললুম, সাহেব কি কুঠীতে আছেন রামপ্রসাদ! আমার দরখাস্তখানার কি হল?

তাচ্ছিল্যভাবে জানাল সে, আপকো চাক্‌রীতো সাহেব খতম কর দিয়া আপিস মে আপকো যানা নেহি পড়েনা!

গম্ভীর হয়ে রইলুম অনেকক্ষণ। এর পরে এইরাত্রে আর সাহেবের সঙ্গে দেখা করেই বা লাভ কি। তবুও সাহস সঞ্চয় করে বললুম, সাহেবের সঙ্গে আমার একবার দেখা করা দরকার।

রামপ্রসাদ রূঢ় ভাবে উত্তর জানাল, সাহেবের সঙ্গে এখন দেখা করার আর্জ্জি পেশ করতে সে মোটেই ইচ্ছুক নয়। সাহেব এখন তোমার মত লোকের সঙ্গে দেখা করবেন না।

আশ্চর্য্য হলুম একবার। সন্ধ্যায় অফিসের ফাইল বড়সাহেব অনেক দিনই দেখেছেন এবং এজন্য আমাকে কতদিন আসতে হয়েছে এখানে। অথচ আজ আমার প্রবেশ নিষেধ।

এগিয়ে যাবার উপক্রম করছিলুম, রামপ্রসাদ রূঢ়কণ্ঠে বললে, হুকুম নেহি হ্যায় বাহার যাও।

রামপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে একটু বিষাদের হাসি হেসে আমি ফিরে এলুম। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এই পরিণতি ঘটবে এটা কল্পনা করতে পারিনি। রামপ্রসাদটাও সুযোগ বুঝে আঙুল ঘোরাতে শিখেছে। ওর রুক্ষস্বর আর তাচ্ছিল্য একটি হীনমন্যতার ভাব জাগিয়ে তুলল। সসঙ্কোচেই ফিরে এলুম।

অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে চলতে একটা সেলুনের পাশে এসে দাঁড়ালুম। আয়নায় দেখতে পেলুম, মাথার চুলগুলো যেন সব সাদা হয়ে গেছে। কি যেন খেয়াল হল সেলুনেই ঢুকে পড়লুম।

আধঘণ্টা পরে যখন সেলুন থেকে বের হলুম, তখন উপলব্ধি করলুম, পিছনের চুলের কোন অস্তিত্বই নেই। অন্যমনস্কতার সুযোগে বাধা দেবার অবকাশ পর্য্যন্ত পাইনি।

চোখটা পরীক্ষা করে নিয়ে একজোড়া চশমাও কিনে ফেললুম। ভাবলুম দাঁতের ব্যবস্থাও কাল করতে হবে। চাকুরীটা তো গিয়েছেই, সেজন্য এসব ব্যবস্থা যা এতদিন করি করি করেও করে উঠতে পারিনি, তা আর বাকী রাখি কেন? চাঁদনি থেকে একটা স্যুট কিনে সেটা পরিধান করে ছোট সাহেবের মতো শিষ দিতে দিতে অন্দরে ঢুকে পড়লুম।

গৃহিণী আমার এই অপ্রত্যাশিত নবরূপ দেখে বিস্ফারিত লোচনে বলে উঠ্‌লেন, কাল খাব কি তার ঠিক নেই, আর আজ তুমি এলে সং সেজে।

গম্ভীর হয়ে বললুম, আর একটা বড় ফার্মে চাকরী পেয়েছি। মাসে পাঁচশ টাকা মাইনে। ধুতি চাদর চলবেনা সেখানে। তাই এ সাজ পোষাক।

একগাল হেসে তিনি বললেন, তাই বল! নইলে এক কথায় চাকরী ছেড়ে দেবার পাত্র তুমি নও! তলে তলে এই কাণ্ড করেছ অথচ আমাকে বিন্দুমাত্র জানাওনি। থামাকা আমাকে বকিয়ে মারলে।

একটু হাসলুম এ কথায়। অফিসে দাবার চালটা খাটলনা। কিন্তু অন্দর মহলে তার একটু পরীক্ষা হতে দোষ কি? অন্ততঃ কিছু কাল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা যাবে।

তিনি সযতনে পাখার হাওয়া দিতে লাগ্‌লেন। যত্নের মাত্রাটা প্রতি পদেই বৃদ্ধি পেয়ে আস্‌তে লাগল।

পরদিন সকাল সকাল রান্না শেষ করে তিনি এসে জানালেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। নতুন অফিস, বড় চাকরী। একটু আগেই যাও।

বিস্ময়ের ভান করে বললুম, অফিস তো এখানে নয়! আফ্রিকায় আমাকে যেতে হবে পরশু জাহাজে। মাস খানেকের পথ সেটা।

গৃহিণী সন্দিগ্ধ নয়নে তাকাতে লাগলেন। আমি মৃদু হেসে বললুম, একটু দূরে না গেলে কি ভাল চাকরী হয়। এর মাইনেও বেশী, ভবিষ্যতও ভাল। তাইতো ঐ চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে এটা নিলুম।

তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার এই চাকরীটা কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

উত্তর দিলুম, সে কি হয়। ছাড়বার পর আর ফিরে পেতে দেবে কেন। লোক পর্য্যন্ত নিয়েছে ওরা। তা ছাড়া আমিতো ভাল চাকরী পেয়েছি এটা।

অসম্মতি জানিয়ে তিনি বলে উঠলেন, কাজ নেই তোমার এ চাকরীতে। অত দূরের দেশে তোমার চাকরী করা চলবেনা। বাউণ্ডুলে হয়ে এবয়সে ঘুরে বেড়ানোর দরকার নেই। এটা ফিরে না পাও আর একটা খুঁজে নাও।

আশ্চর্য্য হবার ভান করে বললুম, সে কি হয়? দলিলে সই করে এসেছি। এখন ছাড়ি কি করে?

গৃহিণী বিরক্তির মুখে বললেন, তা হোক, বাহাদুরে পেয়েছে তোমাকে। আমাকে না জানিয়ে কি কাণ্ড করে বসেছো, বল দেখি। দেশান্তরে তোমার চাকরী করতে হবে না।

সংসার চরিত্রম্

গম্ভীর হয়ে বললুম, এমন ভাল চাকরীটা ছেড়ে দিলে সংসার চলবে কি করে ?

তিনি সবেগে মাথা দুলিয়ে বললেন, সে আমি একরকম চালিয়ে নেব। আমার পাশ বইয়ে যে কটা টাকা আছে, সেটায় যতদিন চলে চলুক, নইলে গয়নাও তো রয়েছে দু একটা। পেন্সন না পাওয়া পর্য্যন্ত তাই দিয়েই চলবে। চাকরী বাক্‌রী না পাও তাহলে বরঞ্চ একটা কন্ট্রোলের দোকান খোলো। সংসার চলেই যাবে একরকম।

পরদিন থেকে কন্ট্রোলের দোকান খোলবার প্রচেষ্টায় নানান অফিসে ধর্ণা দিতে লাগলুম। মাসখানেক এমনিভাবেই কেটে গেল। কন্ট্রোলের দোকান প্রাপ্তির আশা মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল। পাশ বই এর টাকা কটাও ফুরিয়ে গেল।

পেন্সনের কোন খবর নেই। মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে অনেকদিন অফিসের পথে পা দিইনি। অভাবের তাড়নায় প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটার জন্য অফিসের দুয়ারে হাজির হতে হল।

অফিসে তখন তুমুল কাণ্ড চল্‌ছে। রামের বোঝা শ্যামের উপর চাপানোর ফলে বিশৃঙ্খলার ভাব দেখা দিয়েছে। পুরানো কাগজপত্রের জরুরী প্রয়োজন ছিল। হাজার চেষ্টা করেও তার সন্ধান মেলে নাই। অসাবধানতার ফলে অনেক টাকাও ক্ষতির আকারে দেখা দিয়েছে।

বড় সাহেবের কাছে ঘেঁষবার সাহস কারও নেই। দিনরাত তিনি বকাবকি করেই চলেছেন। দুজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে তিনি স্বল্পদোষে বিদায় দিয়েছেন। ছোট সাহেবও বদলী হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন।

করালীদাকে সভয়ে বললুম, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটার জন্য এসেছি, দাদা। সাহেবের সঙ্গে দেখা করা যায় কি করে ?

করালীদা গম্ভীর হয়ে বললেন, অসম্ভব ভায়া। ভয়ে ঐ বারান্দায় পর্য্যন্ত ঘেঁসিনে। কখন কার চাকরী যায় ঠিক নেই। সাহেব আগুন হয়ে রয়েছেন।

সভয়ে বললুম, রামপ্রসাদকে বলে আমার কার্ডটা সাহেবের কাছে পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দাও দাদা। ওটা এখন আর আমাকে গ্রাহ্যই করে না।

করালীদা চোখ দুটো বড় করে বললেন, সেটার চাকরী আগেই খতম হয়ে গেছে ভায়া। এখন চানা বিক্রি করে বেড়াচ্ছে সে। সাহেব টাহেবের সঙ্গে এখন আর দেখা হবে না ভায়া। মাসখানেক পরে এসো, তখন দেখা যাবে। এখন উঠে পড়। তোমার সঙ্গে কথা বলছি, দেখতে পেলে আমার চাকরীটাও খতম। সাহেব এখন যখন তখন এসে পড়ে যা বকুনি দেন।

অগত্যা করালীদার পাশ থেকে উঠে এসে সাহস সঞ্চয় করে বড় সাহেবের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালুম। অর্থের প্রয়োজন আমার বিকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

নতুন চাপড়াশীটা ছুটে এসে সরে যাবার নির্দেশ দিল। আমি মরিয়া হয়ে জানালুম, সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জরুরী দরকার।

ছোটখাট একটা বচসা আরম্ভ হয়ে গেল। সহসা পদশব্দে সচকিত হয়ে দেখলুম, বড় সাহেব স্বয়ং এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন। আমি সবিনয়ে আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের প্রার্থনাটা জানালুম।

বড় সাহেব আমার কথায় কর্ণপাত না করে ইসারায় আমাকে তাঁর ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার কাজে অত্যন্ত গাফিলতি দেখা যাচ্ছে। বিনা নোটিশে কামাই আমি আর সহ্য করব না। এই চিঠিগুলির উত্তর আজই দিতে হবে। কাগজ পত্র তৈরী না হলে ছুটী পাবে না।

সভয়ে বললুম, শুনলুম, আমার পদত্যাগটা নাকি মঞ্জুর হয়েছে।

বড় সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, হ্যাঁ, সেটা মঞ্জুর হয়েছে। তুমি আর দেরী করো না। চটপট এ কাজগুলো শেষ করে ফেলো। নইলে ছুটী পাবে না। যাও এখন, আমার অনেক কাজ।

অগত্যা ফাইল পত্র নিয়ে আবার অফিসের এককোণে বসে পড়লুম। আমার জায়গায় অন্যলোক নিযুক্ত হয়েছে, সুতরাং চাকরীটা ফিরে পাবার আশা নেই।

তবু এ কাজগুলো করে দিলে যদি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুবিধা হয় এই ভেবে মনোযোগের সঙ্গে লেগে গেলুম।

করালীদা পিঠের উপর হাতখানা রেখে বললেন, কি ভায়া, আবার চাকরীটা ফিরে পেলে নাকি।

বিমর্ষ বদনে বললুম, না দাদা! এটা বাড়তি খাটুনি জুটল। দেখি এতে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা যদি ফিরে পাই। সংসার অচল হয়ে পড়েছে।

করালীদা চলে গেলেন। অফিসের পুরানো ফাইল পত্র ঘেঁটে যখন কাজ শেষ করে ফেললুম তখন রাত্রি হয়ে গেছে। সবাই অফিস থেকে চলে গেছেন। শুধু বড় সাহেবের ঘরে আলোটা জ্বলছিল।

কাগজ পত্র নিয়ে বড়সাহেবের ঘরে ঢুকলুম। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উত্তরগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং আসল প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করতে লাগলেন। কণ্ঠে তাঁর বিন্দুমাত্র সহানুভূতির লেশ নাই। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটাও যে সহজে পাব সেটা মনে হয় না।

অনেক রাতে তিনি চিঠি পত্র সই করে বললেন, কাল সকালে এসে তুমি নিজে এই চিঠিপত্রগুলি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। আমি আসবো ব্রেকফাস্টের পর।

আমি সভয়ে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কথাটা আবার জানালুম।

বড় সাহেব পাইপে অগ্নি সংযোগ করে বললেন, কত টাকা চাও?

সবিনয়ে জানালুম, সব কটা একসঙ্গে পেলেই ভাল হয়। অল্প কটা টাকা—

বড় সাহেব আপত্তি জানিয়ে বললেন, সেটাতো রিটায়ারের আগে দেওয়া চলে না।

তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললুম, আমার পদত্যাগ পত্রটা তো মঞ্জুর হয়েছে।

বড় সাহেব সহসা হেসে বললেন, ওঃ। সেটা না করলে অসুবিধা হতো একটু। তোমার কেরানীগিরি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু

ঐ কাজটা তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না। সুতরাং নতুন চাকরীর সঙ্গে এটাও তোমার চালাতে হবে। অবশ্য এজন্য একটা অ্যালাউন্স পাবে।

সবিস্ময়ে বললুম, নতুন চাকরী, সেটা তো জানিনে।

বড় সাহেব সহসা গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমাকে আমি সাবধান করে দিলুম। এই নিয়ে দুবার সাবধান করা হলো। কাজে বড্ড গাফিলতি দেখা যাচ্ছে তোমার। তোমার গাফিলতির জন্য কারবারের ক্ষতি হয়েছে অনেক। আর আমি সহ্য করতে রাজী নই। তোমাকে চাকরী দেবার জন্য ছোট সাহেবের পদটা পর্য্যন্ত উঠিয়ে দিতে হ'লো এখান থেকে। অথচ তুমি দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে অফিস কামাই করে চলেছো। কাল থেকে তুমি তোমার নতুন চাকুরীতেই যোগ দিয়ো। মাইনে ঠিক হয়েছে চারশো টাকা। কেরানীগিরির জন্য অতিরিক্ত কিছু টাকা পাবে। কিন্তু সেটা বেশী দিন দেওয়া চলবে না। চলি এখন। কাল ঠিক সময়ে এসো।

সসম্মানে সম্মতি জানিয়ে আমি উঠবার উপক্রম করতেই তিনি বলে উঠলেন, কাল বরঞ্চ আমার কুঠী হয়ে এসো। অফিসের গাড়ীটা তোমায় আনতে যাবে। চায়ের ব্যবস্থা আমার ওখানেই হবে।

সাহেব শিষ দিতে দিতে চলে গেলেন।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

আকাশ ঘনঘোর ঘটাচ্ছন্ন এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে বের হওয়া কল্পনাতীত।

ঘরে আবার চাল বাড়ন্ত। রেশনের যুগ চলছে। মাপা চাল। গুণে গুণে খরচ করতে হয়। আজ আবার রেশন নেবার তারিখ। শুধু চালই নয়, ঐ সঙ্গে আরও অনেক জিনিষ বাড়ন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। গৃহিণী সবে মাত্র

একটা লম্বা ফর্দ্দ নিয়ে এসে আমার সামনে ধরলেন। চোখ বুলিয়ে নিতেও অনেক সময় লাগে। জিনিষগুলি নিত্য ব্যবহার্য্যের। এমনি প্রয়োজনীয় যে কোনটাকেই আবার বাদ দেওয়ার উপায় নাই।

অথচ বাড়ীতে ছাতাটিও বাড়ন্ত। এ যুগে যেমন তেমন একটা বাতাস বাঁকানো ছাতার দামও নিদেন আটটি টাকা। প্রতি মাসেই ভাবি, মাইনে পেলেই একটা কিনে ফেলব। কিন্তু মাইনে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো প্রয়োজন এসে এমনিভাবে জটলা করে যে কিনি কিনি করেও আর কেনা ঘটে উঠে না। সবার প্রয়োজনের দাবী প্রবলবেগে সমুথিত হয়ে, কেনার ইচ্ছাটা শিথিল হয়ে যায়। খরচের বাহুল্যের চাপে সেটা চাপা পড়ে যায়। বর্ত্তমানে তাই এই প্রয়োজনটা কঠিন হয়েই দেখা দিল। এখন এ ধাক্কাটা কি করে সামলানো যায়, ভেবেই ঠিক করে উঠতে পারলুম না।

বৃষ্টিটাও আবার টাপুর টুপুর নয়, একেবারে ঝমাঝম্। কমে যাবার কোন লক্ষণ নাই। মেঘগুলো কয়েকদিন ধরেই জমাট বাঁধছিল। আজ যেন হঠাৎ জমে গিয়ে সহরটাকেই ডুবিয়ে ফেলতে চাচ্ছে।

কবিগুরু কালিদাস আষাঢ়ের এই প্রথম দিবসটাকে অবলম্বন করে এক কাব্য রচনা করেছিলেন। মেঘকে দূত করে তিনি যক্ষপ্রিয়ার কাছে কাব্যের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। এই দিনটার এত প্রাধান্য তিনি কেন দিয়েছিলেন জানিনা। সম্ভবতঃ বাংলার বর্ষার পরিচয় তাঁর সম্যক জানা ছিল না। এই রেশনের যুগের বাংলার বর্ষার পরিচিতিটুকু তাঁর জানা থাকলে কাব্যের শ্লোক-গুলোতে হয়ত কিছু অদল বদল করতে হত।

আকাশের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তায় শঙ্কাকুল হয়ে উঠছিলুম। গৃহিণী এসে তাড়া দিয়ে শ্লেষের সুরে বললেন, ভাবছ কি বসে বসে, বৃষ্টি দেখলেই দিন কেটে যাবে? মুখে দিতে হবে না আজ। বেলা প্রায় আটটা। রেশন আর জিনিষপত্র নিয়ে এসো। নইলে হাঁড়ি উঠবেনা উনুনে।

ঘড়িটাও কেমন যেন দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। বৃষ্টির দিনে বেলাটাও যেন টের পাওয়া যায় না। কোন রকম খবর না জানিয়ে কোন ফাঁক দিয়ে এগিয়ে যায়, ধরাও যায় না। অথচ—

হতাশ হয়ে বললুম, তাইতো, কি করা যায়। ছাতিও নেই।

রাগ করে তিনি বললেন, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক। তাহলেই চলবে। ঘরে যে একটাও দানা নেই। রেশনের তারিখ ফসকে গেলে দিতে হবে সাতদিন উপোস। কতবার বললুম, কালোবাজারী চাল্‌ই দু' মণ কিনে রাখো। শুনলেনা কিছুতেই। কেবল ধর্ম্ম কথা! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর কি? পেটে কিছু না পড়লে ধর্ম্ম থাকে?

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের সময়ে রেশন ছিল কিনা ইতিহাসে তার পরিচয় নাই। কিন্তু কালোবাজারের মহিমায় "বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ" হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? দাম যা দিতে হয়, তাতে ধর্ম্মের চেয়ে পকেটটাই বাধা সৃষ্টি করে। পকেট কি আর তখন এই ঘন বর্ষার কথা ভেবে দেখেছিল?

একটা ছেড়া চাদর আমার সামনে দিয়ে তিনি বললেন, কুড়োমি ছেড়ে, এই চাদরটা জড়িয়ে বের হয়ে পড়ো। ভিজবে কম। বর্ষার দিনে মানুষ না খেয়ে থাকে নাকি?

ভাবলুম, বছরের এই প্রখ্যাত দিবসে যক্ষরাজ বিরহী হয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সে যুগের এখন পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আমি তাই গৃহিনী আর মেঘের তাড়ায় চিন্তার চাপে আকুল হয়ে উঠেছি। প্রিয়া ও মেঘ দুটোই আজ প্রতিকূল।

দুদিন থেকে সর্দ্দিটাও বেশ চেপে বসেছে। নাক দিয়ে অনবরত জল ঝরছে। এই বৃষ্টিতে ভিজলে সেটা যে কায়েমী স্বত্ব বুকের মাঝে বাসা বাঁধতে চাইবে তাতে আর বিচিত্র কি?

অথচ না গেলেও নয়। পেটের চিন্তা চমৎকার। ওটাকে বাদ দেবার উপায় নাই। তা ছাড়া অফিসের টেবিলের উপর জমেছে এক গাদা ফাইল।

এগুলোও আবার সংসারের বাড়ন্ত জিনিষের চেয়ে কম জরুরী নয়। বড়সাহেব নোটিশ দিয়েছেন, আজই সব শেষ করে ফেলতে হবে। কাল বিলাতী ডাক পাঠাবার তারিখ। উপায় নাই, বৃষ্টিতে ভিজতেই হবে।

চাদরটা মাথায় লালপাগড়ীওয়ালাদের মতো জড়িয়ে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লুম। বৃষ্টিধারা পাঞ্জাবীটা গলিয়ে বুকে পিঠে হিমশীতল ঠাণ্ডা পরশ জানিয়ে দিল। "তুষারাত্রিবাতা"টা কি ভালভাবে জানা ছিল না। সর্দিপ্রপীড়িত বৃষ্টিসিক্ত দেহে সে অবস্থার চেয়ে ভাল কি মন্দ ছিলুম ঠাহর করতে পারলুম না। মাথার চাদরটা ভিজে পুলটীশের মত লেপটে রইল। জামা কাপড় আর দেহের অবস্থা তো "সদ্যোস্নান সিক্ত বসনা"র সঙ্গে তুলনা মূলক।

কোন মতে বাড়ন্ত জিনিষের ব্যবস্থা করে যখন গৃহে ফিরে এলুম, তখন ঘড়ির কাঁটাটা দশের কোঠা পেরিয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকাতেই কাঁটা দুটো যেন চোখের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল।

গৃহিণী সিক্ত দ্রব্যাদি ঘরে তুলতে তুলতে শুভদিনটার যে শ্রুতিমধুর ব্যাখ্যা বর্ষণ করতে লাগলেন, সেটা সে যুগের হলে কবিগুরু হয়ত বাজার দরবারে আর্জ্জি পেশ করে ক্ষতিপূরণ আদায় করে ছাড়তেন।

কোন মতে উদর পূর্ত্তি করে আফিসে যাবার জন্য তৈরী হলুম। বৃষ্টি তখনও প্রবল বেগে চলছে। মাঝখানে সামান্য একটু কমে ছিল মাত্র। কিন্তু ঐ কমাটাই যেন প্রচণ্ডতার সূচকমাত্র। এবারের গতিটা তাই আরও ব্যাপক।

গৃহিণী সখেদে জানালেন, এই বৃষ্টির মধ্যে আফিসে না গেলে হত না। আকাশ যে ফুটো হয়ে গেছে। যাবে কেমন করে?

জরুরী ফাইলগুলির কথা তাঁকে জানাতে লাগলুম। বর্ণনাটা শেষ করতেও তিনি দিলেন না। তাচ্ছিল্য ভরে বললেন, ভারী তো কলম পেষা চাকরী, মাইনেও যা পাও, তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তার আবার কথা। পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী।

সবিনয়ে জানালুম, প্রকৃতির দুর্য্যোগ বিধানে পেয়ারাকুলেরও পানি গ্রহণের প্রয়োজন হয় এবং, তদুপলক্ষে শ্বশুরবাড়ী নামক একটা স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। এটা তোমার আমার চেয়ে কম নয়।

তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, হয়েছে, এরজন্য তোমার আর ওকালতি করতে হবে না। যা চাকরি কর, তার আবার বড়াই!

মোলায়েম সুরেই বললুম, চাকরীটা ছোট বটে তাইতেই কাইলের পরিমানটা একটু বেশী। বড় হলে সই করেই খালাস পেতুম। এখন গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত করতে হচ্ছে। আজ তাই না গেলেই নয়।

জানালা দিয়ে বৃষ্টির ধারার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, এই বৃষ্টির মধ্যে তুমি বের হবে কি করে? কুকুর বেড়ালও যে এসময় বের হয় না।

হাসলুম এ কথায়। চাকুরী জিনিষটা যে বৃষ্টির অপেক্ষায় বসে থাকে না, এ কথাটা তাঁকে বোঝান মুস্কিল। অফিসের সময় অনেক আগেই উৎরে গেছে। লেট হবে নিশ্চয়ই। বড় সাহেব এসেই আমার খোঁজ করবেন। তবু উপস্থিত হতে পারলে দায়িত্বটা পালন করা যাবে; কৈফিয়তের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে। অগত্যা ভিজে চাদরটা নিংড়ে নিতে লাগলুম। মাথায় চড়ানোর আগে জলটা যত কম থাকে ততই ভাল। কোন মতে গলিটা ডিঙোতে পারলেই ট্রাম বাস পাওয়া যাবে।

তিনি বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন। আমিও চাদরটা গায়ে মাথায় জড়িয়ে বের হবার উপক্রম করলুম।

সখেদে জানালেন তিনি, একটা ট্যাক্সি করেই অফিস যেয়ো, যা সর্দি লেগেছে তোমার!

সদর রাস্তায় পৌঁছতেই জামা কাপড় অর্দ্ধেকটা ভিজে গেল। ছাদ দেওয়া ফুটপাথে ট্রাম অথবা বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। বৃষ্টির দিনে এ সময়ে ভিড়টা একটু কম হবে বলে আশা করেছিলুম। টার্মিনাসে গিয়ে ট্রাম বাসে উঠতে গেলে জামা কাপড় সব ভিজে ন্যাতা জেবে হয়ে

যাবে। তার দূরত্বটাও আবার কম নয়। তাই এখানে অপেক্ষা করাই ভাল।

আশা ফলবতী হল না। আমার মতো অনেকেরই অফিস যেতে দেরী হয়েছে আজ। কাজেই ট্রামে বাসে স্থান পাওয়া গেল না। বাদুড় ঝোলা ট্রাম আর বাসের আশে পাশে বার বার বৃথাই চেষ্টা করতে লাগলুম। হাতল ধরতে বা পা রাখায় একটু জায়গা পাওয়া গেল না। অনর্থক প্রবল বারি-ধারায় সমস্ত জামা কাপড়ই সিক্ত হয়ে গেল। জুতো দুটোও বাসি লুচির মত লেপটে রইল।

গৃহিণীর উপদেশের কথা স্মরণ হওয়াতে পকেটটা সন্ধান করলুম। যে কয়টি মুদ্রার পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে ট্যাক্সি আরোহণ করা চলে না। ট্রাম বা বাস ছাড়া আর উপায় নাই।

একটা অর্দ্ধ চলন্ত ট্রামের হাতলটা খুঁজে না পাওয়াতে অনৈক আরোহীর হাতল ধরা হাতটা ধরেই লাফিয়ে উঠলুম। পা দুটোও আশ্রয় না পেয়ে অন্য একজন আরোহীর চরণ যুগলের উপরে অধিষ্ঠান হল। দু'দিক থেকে প্রবল আপত্তি ও কটূক্তি বর্ষণ আরম্ভ হল। উভয়ের আত্মরক্ষার প্রয়াসে আমিও সজোরে নিক্ষিপ্ত হলুম। পপাত ধরনীতলে অথবা ট্রামের চাকায় নয়, সেদিকে প্রাণের মমতায় আমার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। পতন হলে, ট্রামের ভেতরটায়; মেমসাহেবের ছোট একটা ছাতার উপর! সেটা ভেঙ্গে গেল কিনা, বোঝা গেল না। চারিদিক থেকে ভিড়ের চাপে নিপিষ্ট হয়ে রইলুম। সিক্ত জামা কাপড়ের জল ও অন্য দেহাশ্রিত শুষ্কতর জামায় স্থান পেতে লাগল।

মেমসাহেব ছাতাটি ফিরে পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন। ইংরাজী ভাষায় অস্পষ্ট অথচ ক্রোধান্বিত স্বরে কি যেন বলতে লাগলেন, বোঝা গেল না। আমিও বুঝতে চেষ্টা করলুমনা। বধিরতাই এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট পন্থা

বিবেচনা করে চুপ করে রইলুম। ট্রামটা ঠিক মতো চললে অফিসে শীঘ্রই পৌঁছোব আশা করে উৎফুল্ল হলুম।

হঠাৎ ট্রামটা থেমে গেল। আরোহীরা নামতে লাগলেন। অফিসের কাছে এসে পড়েছে বলে উৎফুল্ল হয়ে আমিও নেমে পড়লুম।

আশায় জলাঞ্জলি পড়ল। সারা রাস্তাটা জলে জলময় হয়ে পড়েছে। ট্রাম এগোবার আর উপায় নাই। কিছুক্ষণ হতাশ হয়ে তাকিয়ে থেকে, জুতো জোড়া হাতে নিয়ে কাপড় গুটিয়ে জলরাশি অতিক্রম করতে আরম্ভ করলুম। মাথার উপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি তেমনি ভাবেই চলতে লাগল। আমিও অতি সন্তর্পণে এগোতে লাগলুম। কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছি। অফিসে আজ যেমন করেই হোক পৌঁছানো চাই।

ল্যাংড়া কি ফজলী আম জানিনে। এত সতর্কতা সত্ত্বেও তারই একটা দেহাবরণের উপর চরণখানি আশ্রয় নেওয়ায় বরফের দেশের স্কী-খেলার মতো পাটা চকিতে সরে গেল। কেবল তালটা সামলাতে পারলুম না। রাস্তার ঘোলা জলের মধ্যেই চিৎপাত হতে হল। হাত থেকে জুতো জোড়াটাও ছিটকে পড়ে জলের তলায় ডুবে গেল। কোন মতে উঠে অনেকক্ষণ সন্ধান করার পর একটা জুতো আবিষ্কার হল, কিন্তু আর একটার সন্ধান কিছুতেই মিলল না। অগত্যা একপাটি হাতে নিয়েই সামনের একটা ডাক্তারখানায় আশ্রয় নিলুম। জলটা সরে গেলে অপরটার সন্ধান করতে হবে।

পা দুটো আর কোমরে যেন চোট লেগেছে। জামা কাপড়গুলোতেও জল কাদা লেগে অভিনব রূপে রূপান্বিত হয়েছে। অফিস যাবার পক্ষে এগুলোর কোনটাই অনুকূল নয়। অথচ জরুরী ফাইলগুলো না ছাড়লেই নয়। হতাশ হয়ে একটা কুশন চেয়ারেই বসে পড়লুম।

অবাঞ্ছিত উপস্থিতি ডাক্তারবাবুর কাছে প্রীতিকর মনে হল না। ঠোঁট থেকে অদ্ভুত একটা প্রতিবাদের সুর ভেসে এল। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ভ্রুকুঞ্চিত করে তিনি বললেন, চেয়ারটায় বসলেন কেন? কি চাই আপনার?

কথাটার ঝাঁঝটা একটু তীব্র। বুঝলুম আমার পোষাকের রূপ আর একপাটি হস্ত-ধৃত জুতা তাঁর চিত্তে আলোড়ন জাগিয়েছে।

বললুম, বৃষ্টির জন্য ঢুকে পড়েছি এখানে। জুতো পড়েছে জলের মধ্যে। একপাটি পেয়েছি, জলটা কমলে আর একপাটি খুঁজে নিয়ে চলে যাব।

বিরক্তির সুরে বললেন তিনি, এটা ধর্মশালা নয়, জুতো খোঁজার স্থানও নয়। এটা ডাক্তারখানা। জুতো খোঁজার ব্যবসা আমার নয়। বের হয়ে খুঁজে দেখুন। পান ভালই, না পান ঐ একপাটি পায়ে দিয়েই বাড়ী চলে যান। মানাবে ভাল।

বিরক্ত হয়ে বললুম, সে উপদেশের জন্য আপনার কাছে আসিনি। খুঁজে না পেলে কি করা যাবে, সেটা আমার জানা আছে।

রূঢ়স্বরে জবাব পেলুম, কলকাতা সহরে একপাটি জুতো হাতে কেউ রাস্তায় ঘোরে মশায়। চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন আগে। মাথায় ছিট আছে নাকি কিছু ?

ব্যঙ্গোক্তিকে উপেক্ষা করে বললুম, মাথার চিকিৎসার আবশ্যক নেই ; তবে পায়ের দরকার। পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে।

গুম্ফের অন্তরালে মৃদু একটা হাসি দেখা দেওয়ায় সজারুর কাঁটা সদৃশ গুম্ফগুচ্ছ ঈষৎ নাড়াচাড়া করে উঠল তাঁর। হাত দুটো দিয়ে সেগুলোকে সযত্নে ঠিক করে বললেন তিনি, চিকিৎসার প্রয়োজন আপাদমস্তকেরই। পড়ে গিয়ে শুধু পায়েই লাগেনি, মাথাটাও বাদ যায় নি দেখছি। কবছর আগে পড়ে গেছলেন ?

গম্ভীর হয়ে বললুম, এই মাত্র পড়ে গিয়ে পায়ে আর কোমরে ব্যথা পেয়েছি। আর আপনি ঠাট্টা করছেন। একটা ঔষধ দরকার তাই—

হেসে বললেন তিনি, ঠাণ্ডা তেল এখানে পাওয়া যাবে না। আপনার দরকার কবিরাজ। উঠুন এখন। একপাটি জুতো হাতে লোক ঘোরে এই প্রথম দেখলুম।

জুতোটি বাইরের ফুটপাথে। ফেলে দিয়ে বললুম, পাটা মচকে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ফুটপাথে আমের খোসায়—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন তিনি, থাক্ এখন। উঠুন আপনি। পা-ই হোক আর মাথাই হোক, আমার এখানে চিকিৎসা হবে না। ভিজে কাপড়ে দামী কুশন চেয়ারের দফাটা নিকেশ করলেন। এর দাম কত জানেন? ক্ষতি পূরণ দিতে পারবেন? উঠুন—।

অগত্যা উঠে জানালুম, পা'দুটো আর কোমর টনটন করছিল মশায়, তাই একটু বসে ছিলুম। আপনার আপত্তি থাকে উঠে যাচ্ছি। ডাক্তারখানায় ঔষধ পাওয়া যায় না, একথাও শুনিনি কোনদিন।

উচ্চস্বরে বললেন তিনি, বটে! শ্রীচরণ পরীক্ষার জন্য এসেছেন। ঔষধ নেবার মণ্ডল সঙ্গে আছে তো? আমার ভিজিট ষোল টাকা, আর মালিশের দাম চার টাকা। দিতে পারবেন? রাখুন ঐ টেবিলের উপরে।

এবম্বিধ মুদ্রা আমার পকেটে নাই, একথা স্বীকার করতেই হল। ডাক্তারখানাটি ছোট। বিত্তাবত্তাও খুব বেশী বলে মনে হল না। তাঁর ভিজিট ও ঔষধের দাম এই বৃষ্টির দিনে নব পরিস্থিতিতে রকেট গামী হয়ে দেখা দেবে একথা কল্পনাও করতে পারি নি। বুঝলুম আমার কর্দমলিপ্ত পোষাক আর একপাটি জুতাই তাঁর চিত্ত বিভ্রমের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। মেজাজটাও বা রুক্ষ। এরপর আর থাকা চলে না। বাইরের প্রবল বারিপাত উপেক্ষা করেই ফুটপাথে নেমে পড়লুম।

"পাদেন চ খঞ্জ", তৃতীয়া বিভক্তির এই রূপটি যেন বাস্তব হয়ে দেখা দিল। অনেকের জীবনেই হয়ত হামেশাই এটা দেখা দিয়ে থাকে কিন্তু এই বৃষ্টিসিক্ত আষাঢ়ের প্রথম দিনে অফিস গমনাকাঙ্খী মদীয় দেহে তার প্রভাবটা ব্যাপক হয়ে দেখা দিল। মনের উপরও তার প্রতিক্রিয়াটা কম হল না।

ফুটপাথে নিক্ষিপ্ত জুতাটার কোন সন্ধান পেলুম না। মনুষ্য অথবা মনুষ্যেতর কোন জীব সেটা নিয়ে যে কখন সরে পড়ল তা টেরই পাইনি।

ডাক্তারবাবুর ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্ত হয়ে জুতোটা না ফেলে দিলেই হতো। সস্ত কুড়ি টাকায় জুতো জোড়া কেনা হয়েছিল। কাজেই একপাটি হলেও মায়াত্যাগ করতে কেমন যেন কষ্টবোধ হচ্ছিল।

বারিবর্ষণটা ক্রমশঃ কমে এল। রাস্তার জলও অনেকটা কমে গেল। অতি কষ্টে খঞ্জ পা নিয়ে পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত পথে এগোতে লাগলুম। ম্যানহোলের পাশে এসে সহসা দেখতে পেলুম, প্রথম হারানো জুতার পাটিটা তার ফ্রেমে আটকে রয়েছে। সারা গায়ে তার কাদা। নতুন জুতার কাদা লাগানোর ফলে একটা অদ্ভুত রূপ ধারণ করেছিল সেটা।

জুতোটি তুলে কাদা ধুয়ে নিলুম। ডাক্তারখানার সামনে ফুটপাথে অপরটির সন্ধান আবার নিলুম। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। উপরন্তু জানালা ও দরজার ফাঁক দিয়ে ডাক্তারবাবুর কৌতুক দৃষ্টি আর গুম্ফায়িত হাসি মনটাকে বিগড়ে দিল। অগত্যা কুড়ি টাকার মায়া বিসর্জন দিয়ে সে পাটিটাও ফেলে দিলুম।

ডবল ভাড়া দিয়ে রিক্সা করে বাড়ীতে ফিরতে হল। গৃহিনী কম্বল মুড়ি দিয়ে বিশ্রাম উপভোগ করছিলেন। অসময়ে আমাকে দেখে বলে উঠলেন, অফিস বুঝি আজ রানীডে হয়ে গেল।

বিরক্তি প্রকাশ করে বললুম, অফিসে যাওয়াই হয়নি আজ। দেখছনা জামা কাপড়ের অবস্থা। জুতো জোড়াটাও হারিয়ে গেল।

নগ্নপদের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। বিস্ফারিত লোচন নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, কোথায় যুদ্ধ করে এলে গো? জুতো নেই, সারা জামাকাপড়ে কাদা ছিটানো। যাচ্ছ অফিসে আর ফিরলে হোলী খেলা করে। এ বুড়ো বয়সে জংলী স্বভাব কেন?

জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে পতনের ইতিহাস জানিয়ে বললুম, পাদুটো বেশ মচকে গেছে। কোমরেও একটু চোট লেগেছে। এখন ব্যথাটা সকালে সারলে হয়।

ঠাট্টা করে বললেন তিনি, গরীবের কথা বাসী হলে মিষ্টি লাগে। বললুম একটা ট্যাক্সি চেপে অপিসে যেয়ো, তখন কথাটা কানে ঢুকল না। পয়সা বাঁচাবার ফন্দী। এখন বোঝ ঠেলা! এই বাদলার দিনে অপিসে না গেলেই হত না। ফাইলই এত বড় হল।

সচকিত হলুম এ কথায়। গণ্ডগোলের চাপে কথাটা প্রায় ভুলেই বসেছিলুম। অফিসের জরুরী ফাইলগুলো চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কতকগুলো ফাইল আজই ছাড়া চাই! বৃষ্টিটাও এই সময় থেমে গেছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলুম, তিনটা বেজেছে। এখনও তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারলে ঘণ্টা দেড়েক কাজ করা যাবে। পা আর কোমরের ব্যথাটা ফাইলের চিন্তায় কমে এল। তাড়াতাড়ি বেশভূষা সেরে নিলুম।

তিনি আপন মনে এক তরফা উপদেশ বর্ষণ করতে লাগলেন। আমার বেশভূষা দেখে বলে উঠলেন, রাতে বসবে নাকি তোমার অফিস! সেজে-গুজে চলেছ কোথায় আবার।

গম্ভীর হয়ে বললুম, অফিসের কাজ তুমি বুঝবে কি? এখনই যেতে হবে। অনেক জরুরী কাজ আছে।

বিছানা দেখিয়ে তিনি জানালেন, ও গুলোও নিয়ে যাও তোমার অফিসে। ফাইল কোলে করে দিব্যি রাতটা কাটিয়ো!

কথাটার জবাব না দিয়ে লাঠিটায় ভর করে খঞ্জ পদে অগ্রসর হলুম। একটা ট্যাক্সি করেই অফিসে যাব।

তিনি অবাক্ হয়ে বললেন, ছড়ি হাতে ফুলবাবু সেজে অফিস যাওয়া তো জন্মে দেখিনি। এ আবার কেমন অপিস গো। গায়ে একটু স্নো, আতর, লাগিয়ে যাও। নইলে সাহেব আবার ছড়িটা নিয়ে কি কাণ্ড করেন, তার ঠিক কি? পা-টাতো গেছেই, পিঠটা আর বাকী থাকে কেন?

ক্রুদ্ধ একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ী থেকে বের হয়ে এলুম।

ট্যাক্সি পাওয়া গেলনা। দুচারটা যা গাড়ী দেখা গেল, সব প্রাইভেট। অগত্যা একটা বাসেই চেপে বসলুম। ভিড়টা একটু কম ছিল কিন্তু বসার জায়গা পেলুম না। খোঁড়া পায়ের উপর দাঁড়িয়েই ছাতের রডটায় বাদুড় ঝোলা হয়ে চললুম। মাঝে মাঝে বাসটা থামছিল। অনেক কষ্টে ঝাঁকুনি-গুলো সামলে নিতেই প্রাণান্তকর মনে হচ্ছিল। নামার চেয়ে উঠার ভাগটাই বেশী হচ্ছিল। আমিও ক্রমশঃ কোনঠাসা হয়ে পড়ছিলুম।

অফিসের কাছাকাছি এসে পড়েছিলুম। সহসা একটা সোরগোল উঠে পড়ায় বাসটা থেমে গেল। একটা পকেটমার ছোঁড়া ধরা পড়েছে বামালসুদ্ধ। ভদ্রলোকের পকেটে ছিল মাত্র সোয়া পাঁচ আনা পয়সা। তাই নিয়েই এই কাণ্ড।

পুলিশ এসে পড়ল। বাসটা চোখের সামনে গন্তব্য পথে চলে গেল কিন্তু আমরা কয়জন যেতে পারলুম না। থানায় গিয়ে বিবরণী দিয়ে আস্তে হবে। তারপর সাক্ষী সাবুদ আরও কত কী!

অনেকক্ষণ পরে মুক্তি পেলুম। ঘড়িটা দেখবার সুযোগ হলনা। অফিস হয়ত তখন ও বন্ধ হয় নি।

অতি কষ্টে লাঠির উপর ভর করে আবার বাসে উঠলুম। ভিড়ের মাত্রাটা আগের চেয়ে আরও বেশী হয়ে দেখা দিল। বাসটা অফিসের পাশ ঘেঁসেই চলে গেল। তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম। অন্ততঃ পাঁচছটা ফাইল এখনও ছাড়তে পারব। বড়সাহেবকে সব কথা জানাতে পারলে তিনি খুব খুসীই হবেন এতে। নিজের দেহের চেয়ে ফাইলের উপরে আমার মমতা ও দায়িত্ববোধ কত বেশী এটা প্রমাণ করবার একটা সুযোগ পাব, বলে খুসীই হয়ে উঠলুম।

অফিসের দরজার পাশে এসে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। সবগুলো দরজায় প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। দূরে গির্জ্জার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি পাঁচটা অনেক আগেই বেজে গেছে। হতাশ হ'য়ে এদিকে ওদিকে তাকাতে

লাগলুম। ফাইল আর বিলাতী ডাক দুটোই চোখের সামনে সর্বেঙ্কুল হয়ে দেখা গেল। কাল বড়সাহেবের কাছে কি মধুর সম্ভাষণ পাব, তাই ভেবেই আকুল হলুম।

বিমর্ষ মুখে ফিরতি-মুখো বাসের সন্ধান করতে লাগলুম। সারাদিনের অভিযান শুধুমাত্র ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হলনা, ক্ষতির একটা বড় আকারেই দেখা দিল। বাসে আর উঠা যাবে কিনা সন্দেহ। যা ভিড়! পা আর কোমরটা ব্যথায় টন টন করে উঠল। একটা ট্যাক্সিই নিতে হবে। তার ভাড়াটাও আবার কম নয়।

আকাশটা কালো হয়ে উঠেছে। বিজলী জ্বলে উঠল হঠাৎ। কড়কড় শব্দে মহানগরীটাও যেন কেঁপে উঠল। আবার প্রবল উচ্ছ্বাসে নেমে পড়বে বর্ষার বরিষণ।

হায়রে আষাঢ়ের প্রথম দিবস! তোমার মেঘদূত আমার উপরে নিমোনিয়া না চাপিয়ে রেহাই দেবেনা।

এখন মানে মানে বাড়ী ফিরতে পারলে বাঁচি!

শঠে-শাঠ্যম্

পরোপকার আর অর্থোপার্জ্জন এদু'টো বিপরীত মুখী বৃত্তি যখন বৃদ্ধ বয়সে প্রবল হয়ে দেখা দিল, তখন হোমিওপ্যাথীর শরণাপন্ন হলুম। ঔষধের গোটা দুই বাক্স ও খান কয়েক হোমিওপ্যাথীক বই এর জোরে ক্রমশঃ প্রথিতযশা ডাক্তার হসে উঠলুম। কর্ম্মহীন পেন্সন প্রাপ্ত জীবনে একটা কর্ম্মেরও সংস্থান হল। প্রথমটা বিনাপারিশ্রমিক রোগী দেখা এবং বিনা পয়সায় ঔষধ দেবার ব্যবস্থার ফলে রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পরে

হাত গুটিয়ে অর্থের ছোট খাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে রোগীর সংখ্যা কমে গেল বটে, কিন্তু এলোপ্যাথীক ঔষধের খরচের বাহুল্যে রোগীর অভাব পূরণে বিশেষ বিলম্ব হল না। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতিবেশীর বিস্ময় ও এলোপ্যাথীক পড়শী ডাক্তারের ক্রোধ দুটোই পেয়ে আসছিলুম। আমার চিকিৎসায় অনেক দুরূহ রোগও সেরে যেতে লাগল। রোগিণীর সংখ্যাও বড় কম ছিল না।

স্ত্রীরোগীর চিকিৎসা আমার গৃহিণী পছন্দ করতেন না। বলতেন তিনি, সারা জীবন করে এলে আপিস আর ফাইলের কাজ। বুড়ো হয়ে হলে ডাক্তার। দুপয়সা আসছে, আসুক! পুরুষদের মেরে ফেলছ, আপত্তি নেই। কিন্তু অবলা জাতির উপর এ আক্রোশ কেন? তুমি এদের চিকিৎসার কি বোঝ?

হেসে বলি, রোগের লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে ঔষধ দিই। সেরেও যায়। পয়সার অভাবে যারা চিকিৎসা করাতে পারে না, তারাই তো আসে? তোমায় চিকিৎসা আর তো করছিনে।

তিনি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলেন, আমার দায় পড়েছে তোমার মত হাতুড়ে ডাক্তারের ঔষধ খেতে। ওর একফোঁটা খেলে যে দুদিন বাঁচার আশা আছে, তাও থাকবে না। জানা আছে আমার তুমি কেমন বদ্যি।

হেসে জানাই, তবুও দুচার পয়সা ঘরে আসছে। তাতে সংসারের খরচেরও একটা আশ্রয় হয়।

বলেন তিনি, তাইতেই তো চুপ করে থাকি কিন্তু তাই বলে তুমি মেয়েদের বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবে এ আমি সহ্য করতে পারিনে।

চুপ করে যেতুম একথায়। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের উপর পক্ষপাতিত্বের ভাবটা কি বেশী কিম্বা এটা ঈর্ষারই আর একটা প্রকাশ তাই চিন্তা করতুম।

সম্প্রতি এ ভাবটা একটু প্রকট হয়েই দেখা দিয়েছে। কিছুদিন হল পিত্রালয় থেকে তিনি এক সন্দিগ্ধ পরায়না মুখরা ঝি আমদানি করেছেন। সেটি আবার মহরা বংশোদ্ভবা। পিঠে ছোট একটা কুঁজ সে জামার আড়ালে ঢেকে রাখত। চেহারাটাতে মাধুর্য্যের লেশমাত্র নাই।

এতে অবশ্য আপত্তির কিছু নাই। আপত্তির মূল কারণ হচ্ছে তার দূতীগিরি স্বভাব আর অনৃত ভাষণে দক্ষতা। সালঙ্কারে গৃহিণীর কাছে অনর্গল মিথ্যা কথা বলে মনোরঞ্জনের চেষ্টা করত। তিনিও খুশী হয়ে অকাতরে মূল্যবান জামা কাপড় বিতরণ করে বসতেন। টাকা পয়সা তো ছুটতোই।

প্রথম প্রথম জিনিষটা গায়ে লাগাতুম না। কিন্তু শেষটায় যখন আমিই ঝিটির সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়লাম, তখন সেটা অসহ্য হয়ে দাঁড়াল।

অথচ বলবারও কিছু উপায় নাই। শ্বশুরালয়ের প্রেরিত ঝি, গৃহিণীর আদরের বস্তু। কোন কিছু বলবার উপক্রম করলেই তিনি চেঁচিয়ে অনর্থ করেন, শেষটায় অশ্রু বর্ষণ করে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। ঝি বেচারীটিও তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। কাজেই আমার কথাগুলো তার কানে ঢুকত না। বাড়ীর একটা বাড়তি লোকের মতই সে আমাকে ধরে নিয়েছিল।

সহিষ্ণুতার সীমা বলে একটা জিনিষ আছে, ঝিটি সম্ভবত সেটা আমল দিত না। বাধা পেয়ে সে আমার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সমালোচনাতেও সে কুণ্ঠিত হত না।

ঝিটিকে বেশ একটু ভালকরে শিক্ষা দিয়েই বিদায় করা দরকার কিন্তু কি ভাবে সেটা সম্ভবপর হয় সেটা ঠিক করে উঠতে পারলুম না।

ইদানীং আমার বাক্স থেকে প্রায়ই টাকা পয়সা অন্তর্দ্ধান করত। সতর্কতার ফলে ঝিটি একদিন হাতে নাতে ধরা পড়ল বটে, কিন্তু গৃহিণীর প্রতিবাদের ফলে কিছু ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হল না। ফলে মূল্যবান জিনিষ

গুলো একে একে প্রায়ই অন্তর্হিত হতে লাগল। খানিকটা চেঁচামেচি করে চুপ করে যাই। কিছু বলতে গেলেই, গৃহিণী নাকি সুরে কান্না তোলেন, ঝিটির দাপটও বৃদ্ধি পায়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটা ডাক আসায় ঔষধের বাক্সটি নিয়ে রওনা হলুম। রোগীটি অবস্থাপন্ন ঘরের। দু'পয়সা প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। খানিকটা এগিয়ে যাবার পর ঝিটি দিব্যি আমার পিছু নিয়েছে। সংসারের কাজ কর্ম্ম ফেলে এই সময়ে আমার পিছু পিছু আসার কারণটা বুঝতে পারলুম না। পিছন ফিরে বললুম, কোথায় যাচ্ছিস্?

বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সে জবাব দিল, আপনার সঙ্গে যেতে মা-ঠাকরুণ বলে দিলেন। বাক্সটা আমার হাতে দিন, বাবু। কষ্ট হচ্ছে আপনার।

দরদটা যেন উদ্দেশ্যমূলক মনে হল। ভাবটা দেখে পিত্ত জ্বলে উঠল। গম্ভীর হয়ে বললুম, তোকে যেতে হবে না। বাড়ী ফিরে যা।

মুচকি হেসে সে বললে, সে কি হয় বাবু? মাঠাকরুণ বলে দিলেন আপনার সঙ্গে যেতে। কোথা থেকে নেশা ভাঙ করে আসেন, সেটা জানতে চান। ও সব চলবে না বাবু।

স্পর্দ্ধা দেখে অবাক হলুম। লাঠিটা হাতের ডগায় সুড় সুড় করে উঠল। ক্রোধের বশে খানিকটা তুলে ধরবার উপক্রম করতেই ঝিটি পিছনে হটে, সানুনাসিক সুরে চীৎকার আরম্ভ করল। রাস্তায় একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেল এবং ঘটনা না শুনেই অনেকে বিরূপ মন্তব্য করতেও ছাড়লেন না। রাস্তার মাঝে হট্টগোল না করাই সমীচীন বোধ করলুম। লাঠিটা নামিয়ে নিয়ে আবার বাড়ীর দিকেই রওনা হলুম। গৃহিণীর সঙ্গে বোঝাপড়া করাটই সবচেয়ে আগে প্রয়োজন।

বাড়ীতে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝিটা নাকি সুরে এমন কান্না আরম্ভ করল যে, আমিই তাতে হতভম্ব হয়ে গেলুম। আমি যে তাকে খুন করে

কর্মিসি; এটা যে তোর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য, এটা জানতেও কসুর করল না।

গৃহিনী চোখ মুখ কুঞ্চিত করে বললেন, তুমি মানুষ না কি! ওষুধ দিয়ে তো মারছই। এখন ঘ্যাক্ত মেয়ে মানুষ মারতে চাও।

ওষুধের বাক্সটা নীচে রেখে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ে শান্তভাবে বললুম, ঝিটির আজই বিদায় দিতে হবে।

ঝিটিও তেমনি আনুনাসিক স্বরে বলল, আমিও আর থাকব না বাপু। আমার মাইনে পত্র চুকিয়ে দাও।

পকেট থেকে টাকা বের করে দিয়ে বললুম, এখুনি চলে যা এখান থেকে।

গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে বললেন, যা, বললেই হল। ও চলে যাক্ আর তুমি দিব্যি নেশা ভাঙ করে এসো। সেটি হচ্ছে না। নিজে তো রসাতলে ডুবেছই, আমাকেও ডুবাবে। ও আছে, তাতেই রক্ষা।

অবাক্ হয়ে বললুম, নেশা ভাঙ করি আমি?

কপালে হাত দিয়ে তিনি জানালেন, না কর, করতে কতক্ষণ? রোজ সন্ধ্যেবেলা ওষুধের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে যাও, যখন ফেরো, তখন চোখ হয় লাল। নেশা ভাঙ করলেই চোখ লাল হয়। জিজ্ঞেস করো ঝিকে। ও সব জানে।

ঝিটি নাকি কান্না জানিয়ে বললে, আমাকে তোমরা বিদায় দাও। এসব কথা বার্ত্তার মধ্যে আমি নাই। নেশা ভাঙ করলেই চোখ লাল হয়, এ কে না জানে? বুড়ো বয়সে বাবুর কি হল গো?

এসব কথার উত্তর দিতেও কেমন যেন ঘৃণা বোধ হল। চোখটা রোজ রাত্রেই একটু লাল হচ্ছে, যন্ত্রণাও হয়। চোখটা উঠবে, না চশমার কাঁচ বদলাতে হবে, এটার একটা পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটা আর এদের কাছে বলেই বা লাভ কি?

ঔষধের বাক্সটা তুলে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে এলুম। ঝিটা যখন গৃহিণীর পক্ষপুটে আশ্রয় পেয়েছে তখন সহসা বিদায় নেবে, এ ভরসা ছিল না। পুরাকালে মন্থরার উৎপাতে শ্রীরামচন্দ্রের সিংহাসন ত্যাগ করে বনে যেতে হয়েছিল। কলিকালের এই মন্থরার হলাহল থেকে পরিত্রাণের উপায় কি তাই চিন্তা করতে লাগলুম।

নির্লিপ্তভাবে কাজ কর্ম্ম করে চললুম। রোগী দেখা আর হোমিওপ্যাথিক বই পড়াতেই সময় কাটতে লাগল। অন্তঃপুরে নানারকম সম্ভব অসম্ভব প্রতিকূল সমালোচনা কানে ভেসে আস্‌তে লাগল। আমি নির্বিকার রইলুম।

হঠাৎ একদিন বাড়ী ফিরে দেখি আমার হোমিওপ্যাথিক একখানি বই উধাও। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেটা পাওয়া গেল না। গ্রন্থখানি আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আবার একটা নতুন কিনে আন্‌তে হল। পুরানো বইটিতে অনেক নোট করা ছিল। সেটি পেলে অনেক সুবিধা হত।

দিন দশেক পরে গ্রন্থখানি আবিষ্কৃত হল স্থানীয় মুদীখানার দোকানে। তখন তার অর্দ্ধেক জিনিষপত্র জড়িয়ে দেবার কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। মুদী জানাল, ঝিটি এটা বিক্রয় করে দিয়ে জর্দ্দা কিনে নিয়ে গেছে। বইটা ফালতু মনে করে সেও আর আপত্তি করেনি।

গ্রন্থখানা হাতে নিয়ে বাড়ীতে ফিরলুম। আজই এর একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

কয়েকজন রোগী অপেক্ষা করছিল। ঔষধ দিয়ে উঠবার উপক্রম করতেই রামভরসা ছুটে এল, তার একমাত্র মেয়ে সহসা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, এখনই যেতে হবে।

রামভরসা কুলীর সর্দ্দার। অনেক লোকজন তার হাতে। এরই সাহায্যে কুলী মহলে আমার প্রথম পশার হয়েছিল।

তীব্র শূলবেদনার রোগী ছিল রামভরসা। আমারই চিকিৎসায় সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। আমার উপর তার অগাধ বিশ্বাস। বললুম, কি হয়েছে রে?

উত্তর দিল সে, অজ্ঞান হয়ে গেছে বাবু। আরও দুবার এমনি ভাবে অজ্ঞান হয়েছিল। সবাই বলছে দানা পেয়েছে।

হাসলুম এ কথায়। দানার উপর এদের কেমন যেন অন্ধবিশ্বাস।

ঔষধের বাক্স নিয়ে রামভরসার সঙ্গে রওনা হলুম। রোগটা যে হিষ্টিরিয়া এটা সহজেই ধরা পড়ে গেল। একটু শুশ্রূষাতেই সে নিরাময় হবে।

ঝিটার কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলুম্ নিজের চেষ্টায় যেটা সম্ভবপর হয় নি, রামভরসার চেষ্টায় সেটা হয়ত অল্পেতেই সমাধান হতে পারে। মস্ত এক কুলীর দলের সর্দার সে। তাছাড়া রামভরসার সঙ্গে তার আলাপের ঘনিষ্ঠতাও রয়েছে খুব। কি করে কথাটা অবতারণা করা যায়, তাই গম্ভীর হয়ে চিন্তা করতে লাগলুম।

রামভরসা অধীর হয়ে বললে, মেয়েটা কি বাঁচবে না? ঐ একমাত্র মেয়েই আমার সম্বল বাবু! যেমন করেই হোক বাঁচিয়ে দিন। কেনা গোলাম হয়ে থাকব চিরদিন।

সাহস দিয়ে বললুম, কোন ভয় নেই। আমি যখন এসে পড়েছি তখন ভাল করেই তুলব। তবে দানাটাকে আগে তাড়ানো দরকার। এ যে মাথার উপর চেপে রয়েছে।

রামভরসা বললে, তাই তাড়ান বাবু!

গম্ভীর হয়ে বললুম্, একটা কঠিন কাজ করতে হবে তোমায়! আমার বাড়ীর কুঁজো ঝিটার সঙ্গে আলাপ আছে তোমার।

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে সে, হাঁ, হুজুর।

ততোধিক গম্ভীর হয়ে বললুম্, ওর সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়েই তো এই বিপদে পড়লে। ওর হাতে অনেক দানা আছে। দেখছনা দানার চাপে কেমন

কুঁজো হয়ে বেড়ায়। এ তল্লাট থেকে ওকে তাড়াতে হবে। তার আগে ওকে গঙ্গায় এক'শ আটটা ডুব দিইয়ে নিতে হবে। তাতে ওটাও রক্ষা পাবে, তোমার মেয়েটাও বাঁচবে। কিন্তু কাজটা কত কঠিন, বুঝতে পারছ তো?

রামভরসা উৎসাহের সঙ্গে বললে, এ আর কঠিন কাজ কি? আমার হাতে অনেক লোক আছে।

বাধা দিয়ে বললুম, সে হবে না রামভরসা। জোর করে কোন লাভ হবে না। বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি পার তবেই হবে। এক'শ আটটার দরকার নেই পঞ্চাশটা হলেই চলবে।

রামভরসা সম্মতি জানাল। বললুম, চান করার পরে ওকে একটু গঙ্গাজল খাইয়ে দিয়ো। বলে দিয়ো, ও যেন আর এমুখো না হয়। হলেই বিপদ। চেষ্টা করে দেখো কি হয়। আমি ঔষধ দিয়ে কতটা পারি, চেষ্টা করে দেখি। যা করবে খুব তাড়াতাড়ি।

রামভরসা দ্রুতপদে চলে গেল। কাজটা ভাল হল না বলে মনে আপশোস হল। ততক্ষণে রামভরসা চলে গেছে।

এক ডোজ ঔষধ আর একটু শুশ্রূষার করেই রোগিণী সুস্থতা লাভ করল। একটু পরেই সে সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে লাগল।

পথে রামভরসার সঙ্গে দেখা। বললুম, তোমার মেয়ে ভাল হয়ে গেছে রামভরসা, বাড়ী যাও এখন।

সে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বলল, বাবুজী আপনার হুকুমের কোন ত্রুটী ঘটেনি। এ কেবল রামজীর কৃপায় ঘটেছে। একশ আটটা ডুব দিয়ে গঙ্গার জল খেয়ে সোজা পুবদিকে চলে গেছে। সঙ্গে দশজন কুলী গেছে। টিকিট করে গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়ে আসবে। আর এ মুখো হচ্ছে না কোন দিন।

সংসার চরিতম্

সংশয়াকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললুম, কোন মুস্কিল হয়নি তো? রাম-ভরসা জানাল, না হুজুর! চুপি চুপি ডেকে নিয়ে জানালুম, দানায় পেয়েছে তাই পিঠে পড়েছে কুঁজ। গঙ্গাস্নান করে এ উল্লাস ছেড়ে গেলে কুঁজটা সেরে যাবে। অমনি সুড় সুড় করে চলে এল। ডুবও দিল একশ আটটা। বলে দিয়েছি রোজ একতোলা গোবর খেতে হবে। আর এ মুখো হবে না বলে গেছে।

অন্তঃপুরের প্রবল কাণ্ড থেকে রক্ষা পাবার উপায় কি, ভাবতে ভাবতে বাড়ী মুখো হলুম। স্বস্তির নিশ্বাসটা বের হয়েও যেন কোথায় আটকে গেল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেই, গৃহিণী নাকিসুরে বলে উঠলেন, কি কাল সাপ পুষে ছিলুন গো। ঐ ঝিটা আস্ত চোর। সর্ব্বনাশ করে ছাড়ল।

বুঝলুম গয়নার বাক্সটা নিয়েই সরে পড়েছে সে। সহজে যাবার নয় ঝিটা। তাই যাবার সময় চরম আঘাত হানল। বিরক্তি প্রকাশ করে বললুম, তোমার যেমন বদ অভ্যাস। চাবী যেখানে সেখানে ফেলে রাখো। গয়নার বাক্সটায় কম্‌সে কম দু'তিন হাজার টাকার গয়না ছিল।

আশ্চর্য্য হয়ে বললেন তিনি, গয়নার বাক্স নেবে কেন? তার চেয়ে দরকারী জিনিষ নিয়ে পালিয়েছে। কাশীর জর্দ্দার দশ দশটা কৌটা! একটাও রাখেনি। যায় আমার রূপোর কৌটা পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে। কি সর্ব্বনাশ করল বল দেখি? এখন পান খাই কি দিয়ে?

স্বস্তির নিশ্বাসটা ভাল ভাবেই বের হয়ে এল।

বস্ত্রহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ

গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়াটা বেশ ভালই লাগছিল। ছাদের উপরে বেশ আরাম করে বসে একটা হালকা ধরনের উপন্যাসের উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলুম। গৃহিণী এসে অধিষ্ঠিতা হলেন। বইখানার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সহসা প্রশ্ন করে বসলেন, কি বই পড়া হচ্ছে এমন আরাম করে?

একটু হেসে বইখানা তাঁর হাতে তুলে দিলুম। বইখানা দুই একবার নাড়া চাড়া করে একটু মুচকি হেসে তিনি বললেন, বয়সের তো গাছপাথর নেই। এই বয়সে প্রেমের কাহিনী পড়তে ভাল লাগে। রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারো না?

জানালুম, ও বই দুটো অনেকবার পড়ে পড়ে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। প্রেমের কাহিনী ভাল লাগে না বটে, তবে বইটি বের হয়েছে নতুন, প্রশংসাও পেয়েছে অনেক। নূতনত্বের একটা মোহ আছে এটা স্বীকার কর তো? ভালবাসাটাতো স্বর্গীয় জিনিষ!

কৌতুকোজ্জল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন, তুমি তো নীরস গদ্য। ভালবাসার কি জানবে তুমি। জীবনে ভাল বেসেছো কোনদিন কাউকে?

সহাস্যে বললুম, ভাল বাসিনি কি রকম? খুব ছোট বেলা থেকেই তো কেবল ভাল বেসেই আস্‌ছি। এখনো তার বিরাম নেই।

সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে তিনি বললেন, বটে! এতদিন এই সত্যি কথাটা প্রকাশ করনি তলে তলে এই কাণ্ড! খুলেই সব কথাটা বলে ফেল না ছাই। শুনি একটু। আমার কাছে আর গোপন করে লাভ কি? তোমার ভালবাসার ধন তো আর কেড়ে নিচ্ছিনে।

মৃদু হেসে জানালুম, নিজেই যখন জানতে চাচ্ছ, তখন আর বলতে বাধা কি? এই ধর, কচি বয়সে ভালবাসতুম মায়ের আদর; শৈশবে লজেঞ্চুস, চকোলেট আর কাঁচামিঠে আম, কৈশোরে লুচিমণ্ডা, যৌবনে পরোটা মাংস আর বর্ম্মাচুরুট, প্রৌঢ়ে—

বাধা দিয়ে বললেন তিনি, হয়েছে! হয়েছে! আমি কি এইসব জিনিষের ফিরিস্তি চাইছি নাকি? বলি প্রেম ট্রেম করনি কোনদিন?

হেসে বললুম, প্রেম বলতে তুমি কি বোঝ জানিনে। সত্যিকার প্রেম স্বর্গীয় জিনিষ। এই ধরনা, একজন তাপসী বলেছেন, প্রেম বিনা হরি লাভ হয় না।

বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি বললেন, ধুত্তোর, কি বলছি আর কি উত্তর দিচ্ছ।

হেসে বললুম, তোমার রং বেরঙের শাড়ী আর চুড়ির রিনিঝিনির কথা ভোলা যায় না মোটেই। তাকে যদি তুমি—

বাধা দিয়ে বললেন তিনি, থাক্, সে কথা কে জানতে চাচ্ছে। ডুব দিয়ে জল খাওনি কোন দিন? হৃদয় টি দান করে ফেলোনি কোনদিন?

মধুর হেসে জানালুম, ওটা দান করবার জিনিস নয় মোটেই। তুলে নেবার উপায় নেই। ঐ লাবডাব শব্দটা একবার বন্ধ হলেই বাস্। আর রক্ষা নেই। আজকাল অবশ্য ডাক্তারেরা এটা নাকি বদলে দিচ্ছেন।

বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কেন? কথায় জারিবোনা তোমার চিরকালের অভ্যাস। বুড়ো হয়েও সেটা ঘুচল না। আরও বাড়ছে সেটা। মোট কথা আমাকে তুমি মোটেই দেখতে পার না। পছন্দ হয়নি তাই। আমাকে নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কত টীকাটীপ্পনি কাটা, তা আমার আর জানতে বাকী নেই।

কৌতুকোজ্জ্বল হাস্যের সঙ্গে বললুম, জীবনের এই শেষ প্রান্তে এসে তোমার এই অভিযোগ মন্দ নয় তো? আমি কি আর তোমার মনের পরিচয় পাইনি মনে কর। এটা ঠিক একটা শুকনো নারকেল। কেবল ছিবড়ে, আর তেমনি শক্ত। ছিবড়ে তুলে ভেঙে ফেল, দেখবে শুধু শাঁস আর জল। জীবন যাত্রার মূল্যবান পাথেয়। ভালবাসার অফুরন্ত খনি। সরু চিঁড়ের সঙ্গে খেতে এমন মধুর লাগবে যে—

ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন তিনি, আমি নারকোলের ছিবড়ে, কথাটা বলতে এতটুকুও বাধলোনা তোমার?

বাধা দিয়ে বললুম, কিছুই বুঝতে পারলেনা, তাই অনুযোগ করছ। নারকোলের ছিবড়েটাও কত উপকারী জান? এটা কখনও থাকে গদীর উপরে, কখনও দড়ির আকারে জড়িয়ে ধরে অক্টোপাশের মত। নট নড়ন চড়ন, নট কিচ্ছু। খপ্পরে একবার পড়লে হয়, এত ভাল লাগে আমার, কেমন চমৎকার দিল্লীকা লাড্ডু।

ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন তিনি, কে তোমাকে সেধে ছিল দিল্লীর লাড্ডু খেতে। এখন বলছো, আমি একটা গেরো, ফাঁসির দড়ি, আরও কত কি?

সহাস্যে বললুম, অয়ি বরাননে, ক্রোধ সম্বরণ কর। গোলাপ মাদক সুগন্ধিযুক্ত পুষ্পবৃন্তে কন্টক রহিয়াছে, ইহা কি তোমার অবিদিত।

গম্ভীর হয়ে বললেন, হুঁ, চিরকালই তো তোমার পথের কাঁটা হয়ে রয়েছি আমি।

হেসে বললুম, ভাগ্যিস ঐ কাঁটাটি ছিল, তাই রক্ষে। কাঁটার হুল আর ফুলের গন্ধ ও দুটোর কোনটা থেকে বঞ্চিত হয় নি বলেই ভালবাসার টানে নাকানি চোবানি খেয়েও টিকে রয়েছি।

তিনি রাগ করে বললেন, ভগবান তোমার কণ্ঠে সরস্বতী বসিয়েছেন ঠিক। কথায় তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই। কিন্তু তার সঙ্গে মুখে চিনির পরিবর্তে খানিকটা কুইনেন দিয়েছিলেন।

হেসে বললুম, যা বলেছো। সেই জন্যই এ দেহে ম্যালেরিয়াটা বড় আনাগোনা করতে সাহস পায় না। দেহটা বিকল হয়েছে সত্য, কিন্তু কুইনিনের রাজটাকে অবহেলা করা চলে না।

গৃহিণী কোন উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেই রইলেন। মুখটাও যেন ক্রমশঃ কঠিন হয়ে আসছিল। আলোচনাটা তিনি সহজভাবে গ্রহণ করেননি মনে হল। এ ঝটিকার পূর্ব্বাভাষ কি না কে জানে। মনটা একটা অজানা আশঙ্কায় ভরপুর হয়েই রইল।

পরিস্থিতিটা সহজ করে নেবার চেষ্টায় নিস্তব্ধতাটা আমাকেই ভঙ্গ করতে হল। পরিহাসের সুরেই বললুম, ম্যালেরিয়াটাকে দূর করে ভাল করিনি বুঝি? রায়েদের এঁদো পুকুরে গোটা কয়েক ডুব দিলেই ওটা হয়ত আবার এসে পড়বে।

তিনি একথায় কর্ণপাত না করে উষ্ণ প্রকাশ করে বললেন, এসেছিলুম একটা কথা বলতে, কিন্তু তোমার যা ভাব দেখছি, তাতে কি কিছু বলবার জো আছে। সবটাই হেসে উড়িয়ে দাও।

সহাস্যে বললুম, এতগুলো কথার মধ্যে সে কথাটা বুঝি বলা হয় নি?

ক্রোধ প্রকাশ করে জোরের সঙ্গে তিনি বললেন, নাঃ, আর তোমায় বলেই বা লাভ কি? আমার কথা কি কোনদিন তোমার কানে ঢোকে? কি ভাবেই যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে সে কেবল আমিই জানি। একবার জিজ্ঞেস করেছো কোনদিন, আমার কি দরকার? সংসারের ভাল মন্দ কিছুই কি জানবার দরকার নেই তোমার? চুপচাপ বসে থাকলেই কি সংসারের চাকা ঘুরবে? একটা গতি করতে হবে না। তোমার হয়েছে কি? নভেল পড়লেই দিন চলবে?

ঝড়টা বড়ই হবে বলে মনে হচ্ছে! কথার ভিতরের গুমোট ভাবটা মনটাকে বেশ একটু দোলা দিল। গৃহিণীর ভূমিকাতেই অস্থির হয়ে উঠলুম। এরপর যখন মূল জিনিষ এসে ধরা দেবে, তখন তার জবাব দেব কি,

ভেবেই ঠিক করতে পারলুমনা। লঘু পরিহাস বাস্তবতার পরিচয়ে স্তিমিত হয়ে এল।

আমাকে নীরব দেখে খেদের সঙ্গে তিনি বললেন, কথায় বলে দুকান কাটা নাকি সভার মাঝখান দিয়ে যায়। তোমার তো আর চোখ কান নেই।

ও দুটো যে থেকেও নেই, যাবার জন্য কড়া নোটিশ দিতে আরম্ভ করেছে, সেটা বেশ ভালভাবেই টের পাচ্ছি। কিন্তু গৃহিণীর প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা সুদূরস্পর্শী। তাই স্থূল জিনিষটার উল্লেখ করে প্রতিবাদের সুর জানাতেই তিনি ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান আছে কিছু। হতে যদি দোজবরে তাহলে টের পেতে। আমার উপর তোমার যা দরদ!

নিষ্ঠুর হলেও কথাটা যেন আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। দরদের এই কমতি ভাবটা কতটা বয়স আর কতটা কণ্ট্রোলের জন্য ভেবে ঠিক করে উঠতে পারিনে। পেন্সনের স্বল্পায়তনটাও সংখ্যায় ঠিক থাকলেও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষের কালোবাজারী মূল্য অনুসন্ধানের পরিক্রমায় যাঁর ঘোরেন তাঁরা এর পরিচিতটুকুও উপলব্ধি করতে পারবেন। দোজবরে হবার ভীষণতটা কি উপলব্ধি হয়নি বটে, তবে বর্তমানের পরিস্থিতিতেই হিমসিম যে আড়ষ্ট হয়ে গেছি। ক্ষীণকায়া অর্থপেটিকা মনটাকেও ক্ষীণতর করে আনছে। এখানে দরদের স্থান কোথায়? বিত্তহীন জনের "ভার্য্যা কুখ্যাতি" হওয়াতো স্বতঃ সিদ্ধ।

তবু গৃহিণীর মনে শান্তির প্রলেপ জানাবার জন্য বললুম, ওসব অলক্ষুণে কথাগুলো আর সামনে ধরে লাভ কি? দরদ যা আছে তোমার জন্য তা কি শুধু এই জন্মের, ও যে জন্মজন্মান্তরের।

গৃহিণীর মনটা যেন নরম হয়ে এল এ কথায়। মুখটায় যেন একটু কৌতুকোজ্জল হাসি দেখা দিল। ঝড়টা এত সহজেই কেটে গেল ভেবে আমিও অনেকটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। বিরলদন্ত মুখে একটু হাসির ছিটাও দেখা দিল।

তিনি সহসা আমার হাতটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি বলছো একথা?

উৎসাহের আতিশয্যে আসন ছেড়ে উঠে তাঁর স্কন্ধদেশে একখানি হস্ত রেখে বললুম, এতদিন ধরেও এ কথাটা বোঝনি? শাস্ত্রেই লেখা আছে এ কথা। তুমি পাণি গ্রহণ করলে, আর কথাটা বুঝতে পারলে না। এতে সন্দেহের অবকাশ থাকলে শাস্ত্রই যে ওলট পালট হয়ে যাবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, জন্মজন্মান্তরের হিসাব বুঝিনে, কিন্তু ইহজন্মেই যা দেখছি। দেখা যাক দরদটা কেমন। ভাল মিলের শাড়ী এসেছে দোকানে। চট্ করে একজোড়া কিনে নিয়ে এসো দেখি। দাম বেশী নয়। ছাব্বিশ টাকা হলেই আটপৌরে একজোড়া পাওয়া যাবে।

উৎসাহ একদম নিভে গেল। কে যেন ষ্টেট এম্পায়ার বিলডিং-এর এক্‌শ সাততলার ছাদ থেকে ধপাস করে আমাকে নীচে ফেলে দিল। চোখের সামনে সব যেন হলদে হয়ে উঠল। সর্ষে ফুল যেন চোখের সামনে নেচে বেড়াতে লাগল। ধপ করে ছাদের উপর বসে পড়লুম।

তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, কি গো? অমন করে হঠাৎ বসে পড়লে কেন? জামাটা গায়ে চড়িয়ে এখনই বেরিয়ে পড়। নইলে কাপড় পাওয়াই কঠিন হবে। যেমন হন্তে দিয়ে লোক ছুটছে। সেই দেখতে পেয়েই তো ছুটে এলুম তোমার কাছে।

উত্তর দেবার মত শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ছিল না। পকেটের কথা উল্লেখ না করাই ভাল। ওটা চিরকালই ঘাটতি বাজেটের সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। নিরুপায়ের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম।

তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, কুঁড়ে হয়ে বসে থাকলে কি এ সব জিনিষ পাওয়া চলে। সবাই তো তোমার মত গোঁফ খেজুরে নয়। চিলের মতো ছোঁ মেরে কাপড় নিয়ে যেতে আরম্ভ করছে। ছুটে গিয়ে কিউ-এ দাঁড়াও।

গৃহিণীর যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে বললুম, ওতো অফকোটার কাপড়। ও নিতে হলে শক্তিমান লোকের দরকার। কিউ টিউ মানে না কেউ এ ব্যাপারে। ও কাপড় পাওয়ার চেয়ে বাঘের দুধ সংগ্রহ করাও সহজ।

রাগ করে তিনি বললেন, সব তা'তেই ঠাট্টা তোমার। একেই তো দ্রৌপদীর মত অবস্থা করেছো, এরপরে তোমার মত—

উঠে দাঁড়ালুম এ কথায়। কথাটা নিষ্ঠুর সত্য। গৃহে কটিবাস পরেই এই কয়মাস কাটাচ্ছি। তন্তুবায় রচিত কুটীর শিল্পের এই দুর্লভ ও দুর্মূল্য সামগ্রীটা এতবৎকাল গামছা নামেই স্কন্ধদেশে শোভিত হত। বর্ত্তমান যুগে অন্তঃপুরে এটা পরিধেয়ের স্থান দখল করে কটিতট বেষ্টনে শোভিত! বর্ত্তমানে কণ্ট্রোলের কল্যাণে এটা ঘরে ঘরে স্থান পেতে কার্পণ্য করেনি। বহির্জগতের সভ্যতার চাকচিক্যের অন্তরালে লোক চক্ষুর অগোচরে লজ্জা থেকে রক্ষা পাবার এই অপপ্রচেষ্টা যেন সহনশীল হয়েই আসছিল। পকেটের রিক্ততায় এই অবস্থায় প্রতিকারেরও পথ নেই। গৃহিণী এরূপ অপরূপ বেশে শোভিত হন নাই বটে, কিন্তু তাঁর বস্ত্র-খণ্ডগুলও যেন আর সেলাইএর বাধা মানতে চাচ্ছে না। অতি সন্তর্পণে তিনি চলাফেরা করেন। সম্প্রতি সে দুটোও বুড়ো ঘোড়ার মতো মাটিতে আশ্রয় নিচ্ছে। গাড়ী চালাবার শক্তি আর নেই।

"সবেধন নীলমণি" একখণ্ড বস্ত্রই সম্বল আমার। সেটাই সযতনে পরিধান করে শাড়ীর সন্ধানে বহির্গত হলুম।

বিফল মনোরথ হলুম অচিরেই। শুধু আমি নয়, আমার মত আরও অনেকে। দেখলুম অপেক্ষমান বিক্ষুব্ধ জনতা প্রায় অর্দ্ধেক দিন অপেক্ষা করে

দোকানীর প্রতি নিকট আত্মীয় সূচক শ্লেষ উচ্চারণ করতে করতে বাড়ী ফিরে চলেছেন। আগামীকল্য বিক্রয় দিবস ধার্য্য করে, একটা নোটিশও টাঙান রয়েছে দেখতে পেলুম।

একবিধ বস্ত্রের আশা পরিত্যাগ করে মাইল দুই হেঁটে গিয়ে এক বন্ধুর শরণাপন্ন হলুম। প্রয়োজনের সময় এরই প্রচেষ্টায় কতবার ডাইং ক্লিনিং থেকে দুই তিনবার কাপড় ছাড়া নিতে পেরেছিলুম। সম্প্রতি এঁর পরিধানে নূতন একটি বস্ত্রের পরিচয় পেয়ে বস্ত্র প্রাপ্তির আশায় কয়েকদিন মোসাহেবী করেছিলুম। মৃদু হাস্যের সঙ্গে সমাধানের একটু ক্ষীণ আশা তিনি দিয়েছিলেন। এই দুর্দিনে সেই আশায় প্রলুব্ধ হয়ে সেই কথাটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলুম।

মুখটা তাঁর সহসা কঠিন হয়ে এল। অনেক তোষামোদ ও সাধ্য সাধনার পর তিনি বললেন, আমার এক বন্ধুর পিসতুত ভাইয়ের খুড়তত শ্যালক সম্প্রতি সিভিল সাপ্লায়ের বস্ত্রবিভাগে বদলী হয়ে এসেছেন। তাঁকে ধরলেই নাকি এ ব্যবস্থাটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বললুম, কালোবাজারীর প্রাবল্যে দৃষ্টিহীনতার ফলে কেবল ঘোলাটে জলেরই পরিচয় পেয়ে আসছি ভায়া। সুতরাং নিকট সম্বন্ধটার পরিচিতে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সন্ধান সৃষ্টি করেছে, তারই মাধ্যমে একটা আনুকূল্যের ব্যবস্থা না করলে সভ্যতার আদিম উপকরণটির অভাবে ঘরে বাইরে জীবনটি দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

বন্ধুবর হাসতে লাগলেন। হাসিটা বজায় রাখতে অনেকটা স্তুতিগান গাইতে হল। শেষটায় আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি তার বন্ধুর সন্ধানে চললেন। আমিও মনে মনে সম্বন্ধের একটা নৈকট্য অনুভব করে অনেকটা উৎফুল্ল হৃদয়ে তাঁর পিছু নিলুম। সূত্র যখন একটা পাওয়া গেছে তখন টানলে একখণ্ড বস্ত্রও হয়ত পাওয়া যাবে।

দৈব বোধ হয় কিছুটা অনকূল ছিল। সুতরাং মেজভাই সহসা অনুকূল হয়ে তাঁর বন্ধুবরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। বন্ধুবর তাঁর পিসতুত ভাইকেও খুঁজে বের করলেন এবং তিনি তাঁর খুড়তত শ্যালককে একটা ব্যবস্থা করবার অনুরোধ জানালেন। অনুরোধ উপরোধের বাহুল্য দেখে মনে হল স্বয়ং মহাদেবও যখন স্তুতিগান, অনুরোধ উপরোধে গলে গিয়ে বরপ্রদান কার্পণ্য করেন না, তখন এই মর জগতের শিবানুচর নর পুঙ্গবদের একটা দাক্ষিণ্যের পরিচয় পাওয় যাবে।

শেষটায় দৈব যেন প্রতিকূল হয়েই দেখা দিল। বস্ত্রাভাবে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিত জানাবার উপক্রম করতেই খুড়তুত শ্যালকটি সক্রোধে জানালেন, তাঁতের কাপড় কিনে নিনগে মশাই। কাপড় দেবার হুকুম নেই। রেশনে তো কাপড় দিচ্ছে।

দুষ্পাপ্য ও দুর্মূল্য তাঁতের কাপড় যে আমার কাছে অস্পৃশ্য আর রেশনের কাপড় নিতে হলে কতখানি দৈহিক শক্তি ও তিতিক্ষার প্রয়োজন সে কথা জানাতেই কটু বিদ্রূপোক্তির পরিচয় পেলুম। পিসতুত ভাই ও খুড়তুত শ্যালকের মধ্যে দুচারটে কথা মনান্তরের সাক্ষ্যই জানাল। এতে আর যাই হোক খুড়তুত শ্যালককে আর বারবার কাপড়ের জন্য ব্যর্থ অনুরোধ জানানো চলে না।

অগত্যা ফিরতে হল। অন্ধকার তখন ঘন হয়ে দেখা দিয়েছে। গৃহিণীর ঘনান্ধকার মুখখানার কথা স্মরণ করে বিমর্ষচিত্তে গৃহের দিকে রওনা হলুম। সারাদিন ধরে হাঁটাহাঁটিতে শরীরটার ক্লান্তি আর বাতের ব্যথাটায় প্রকোপ দেখা দিল।

গৃহিণীর কণ্ঠে ঝড়ের আভাষ পেলুম না বটে, কিন্তু বারিবর্ষণের অনুকূল আভাস পাওয়া গেল। মনটাও কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠল এতে। শাড়ী একটা সংগ্রহ করতেই হবে! নৈশ আহার সমাপ্ত করে ছোট খাট একটা

বিছানা বগলদাবা করে বের হবার উপক্রম করতেই গৃহিণী সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, এতরাতে আবার চলেছো কোথায় ?

এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললুম, কাপড়ের দোকানের রোয়াকটার উপরেই রাতটা কাটাব। শাড়ী একটা জোগাড় করতেই হবে। রাতে না গেলে ভোর বেলায় যে কিউটা হবে, তাতে আর দাঁড়াবার জায়গা মিলবে না।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, আমার জন্য তোমার যা কষ্ট! একটু হেসে বললুম, তুমি নিশ্চিত থেক, শাড়ী একজোড়া না নিয়ে আর বাড়ীমুখো হচ্ছিনে।

হাসি মুখে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন তিনি।

কাপড়ের দোকানের পাশে এসে মনটা দমে গেল। সারি সারি বিছানা পড়ে গেছে সেখানে। বিছানার কিউটা যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে অন্ধকারে সেটা ঠাহর করতে পারলুম না। লেজটার শেষ প্রান্ত খুঁজতে লাগলুম। আমার মতো সুচতুর লোকেরও অভাব নেই দেখে মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। বিলম্বের জন্যই এই বিড়ম্বনা ভোগ করতে হল। খুড়তুত শ্যালকটির সন্ধানে আর আহারের জন্য সময়টা অপচয় না করে কিউএর মস্তকে যদি অধিষ্ঠিত হতে পারতুম তাহলে কাল সকালেই একজোড়া শাড়ী নির্ঘাত মিলে যেতো।

লেজের প্রান্ত খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য মনে হল। দু'এক জায়গায় প্রান্তভাগ মনে করে বিছানা পাতবার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড তাড়া খেতে লাগলুম। হতাশ হয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছিলুম, এমনি সময় একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কৌতুহলী হয়ে একটু এগিয়ে দেখতে পেলুম বন্ধুবরটিও শয্যা পেতেছেন সেখানে। বিস্ময় প্রকাশ করে বললুম, তুমি এখানে। তোমার আর কাপড়ের অভাব কি? এতদূরে এলেন? খুড়তুত শ্যালকটি—

বাধা দিয়ে বললেন তিনি, শাড়ীর জন্যে পাতালে যেতেও রাজী আছি। এ তো একক্রোশ পথ। শ্যালক পুত্রবটি দিয়েছে মাত্র একজোড়ার টিকেট, কি আমার চলে? বুঝলুম ব্যাপার। বন্ধুটির আবার দ্বিতীয়পক্ষ। তাই বস্ত্রখণ্ড প্রয়োজনের সীমারেখা ডিঙিয়ে চলে। নিজের ভাগ্যের পরিচয় পেয়ে মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলুম। বন্ধুবরের সাহচার্যে রাতের কষ্টটাও আর বেশী পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে না।

তিনি বিছানা গুটিয়ে আমার একটু শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। পিছন থেকে একটা আপত্তির মৃদু গুঞ্জন ভেসে উঠল বটে, কিন্তু বন্ধুবরের রসিকতার প্রকোপে সেটা ভেসে গেল। দেখলুম সব মশগুল হয়ে রয়েছেন। আসন্ন শাড়ী প্রাপ্তির আশায় সবার মনেই যেন উল্লাসের ছোপ লেগেছে।

প্রভাতে সদ্য একজোড়া শাড়ী প্রাপ্তির ফলে গৃহিণীর সস্মিত বদনে যে হাসির রেখা ফুটে উঠবে, তার কথা বারবার মনে পড়ায় ঘুমটাও যেন আসছিল না। মশার ব্যাটালিয়ন গুঞ্জন করে তেড়ে আসছিল। শরীরের রক্তও শুষে নিল প্রায় অর্দ্ধেকটা। দুহাতে তাড়িয়েও কুল পাচ্ছিলুম না।

ভোরের আলো ফুটে উঠল। দেখলুম, কিউএর যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে কাপড় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অল্প কোটার পরিমিত বস্ত্রসংখ্যা কিউএর শীর্ষদেশকে কেন্দ্র করেই থাকবে।

তবুও ঘণ্টার উপর ঘণ্টা প্রখর রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলুম। কিউ ক্রমশঃ এগোতে লাগল। আশা এমনি জিনিষ যে তার ঢেউটা এসে মনটাকেও দোলা লাগাতে লাগল। ভাবলুম পরিমিত বস্ত্রসংখ্যা হয়ত আমাকেও তার মধ্যে শামিল করে রাখবে।

পা দুটো টন টন করছিল। মশার কামড়ে সারা গা ফুলে উঠে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। প্রখর রোদের তেজ ও অম্লানবদনে অগ্রাহ্য করে বিছানা কাঁধে করে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে যাচ্ছিলুম। কিউএর সামনের দিকটা ছোট হয়ে এসেছে। আর চার পাঁচ জনের পরেই আমার কাপড় পাবার কথা। সহসা

জানালার মধ্য দিয়ে মুণ্ড গলিয়ে দোকানদার জানাল, অফকোটার কাপড় সব ফুরিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জানালা দরজা সব বন্ধ হয়ে গেল।

কিউএর পিছনের লেজটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দোকানীর উপর সদসৎ বাণী বর্ষিত হতে লাগল। আমিও হতাশ হয়ে কিউএর বাইরে চলে এলুম।

ক্ষুধা ও নৈশ জাগরণে শারীরিক ক্লান্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকালের রৌদ্রতাপ ও নিশ্চেষ্ট দাঁড়ানো তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে। মনটাও ততোধিক তিক্ত হয়েছে। শুধুমাত্র বন্ধুবর রসিকতা করে সেটায় তালিম দিয়ে খানিকটা সতেজ রাখতে পেরেছেন।

অবশেষে তারই উৎসাহে একখানা রিক্সা করেই সুদুর্লভ তাঁতবস্ত্র সন্ধানে রওনা হলুম। নানা দোকানে ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে শেষটায় অত্যন্ত চড়াদামে দু'খানা শাড়ী ক্রয় করে গৃহের দিকে রওনা হলুম। বস্ত্রখণ্ডে রঙের জৌলুষ ছিল কিন্তু সূত্রের সংখ্যার পরিচিতি না জানানই ভাল! রিক্সায় চড়া আর সম্ভব হল না। দোকানীর কৃপায় একটা পান কেনারও পয়সা পকেটে রাখা চলে নি।

সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে ঈষৎ হেলছেন। প্রখরতা বিন্দুমাত্র কমেনি। একটা ছাতি পর্য্যন্তও নেই যে তা থেকে রক্ষা পাব। ঐ দ্রব্যটির সঙ্গে কিঞ্চিৎ বস্ত্রখণ্ড জড়িত থাকায় সেটাও মহামূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে। রৌদ্রের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে না পেরে একটা বৃক্ষতলে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিলুম। বন্ধুবরের এখান থেকেই বিদায় নেবার কথা।

বন্ধুবর শাড়ীর দুর্মূল্যতার কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করে প্রাকযুদ্ধকালীন বিভিন্নরূপী বস্ত্রখণ্ডের ঔজ্জ্বল্য ও মূল্যের ইতিহাস রচনা করতে লাগলেন। শুষ্ক বদনে আমিও নীরবে তার কথায় সায় দিয়ে মনের ক্ষোভ নিবারণের চেষ্টা করছিলুম। শাড়ী কেনার পর পেন্সনের যে কয়টা টাকা রইল তা দিয়ে মাস চলবে কি করে, একথাও বন্ধুবরের অনর্গল ভাষণের অন্তরালে মনের মাঝে আঘাত দিতে লাগল।

বন্ধুবর শাড়ীটা খুলে এটা যে পুরো দশ হাত নয়, তাই প্রমাণ করবার জন্য হাত দিয়ে মাপতে আরম্ভ করলেন। দুষ্প্রাপ্যতার সুযোগে ফাঁকিটা যে শত মুখী হয়ে উঠেছে একথাও তিনি তীব্রভাবে জানাতে লাগলেন।

সৌভাগ্যবশতঃ কি দুর্ভাগ্যবশতঃ জানিনে সহসা বৃক্ষশিখর থেকে একটা ঘন বরিষণের পরিচয় পেয়ে শিহরিত হয়ে উঠলুম। গৃধিনীজাতীয় পক্ষী পুঙ্গব যে মদীয় গৃহিণীর দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত শাড়ী যুগলের উপর এমনি ভাবে পুরীষ নিক্ষেপ করবে একথা জানা থাকলে ক্লান্তি অপনোদনের চেষ্টা থেকে প্রখর রৌদ্রতাপও বরণীয় মনে করতুম।

বন্ধুবর নাসিকা কুঞ্চন করে উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আমিও তৎসহ একটা হতাশার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্ষোভ পীড়িত অন্তর নিয়ে অদূরে ডোবাটার দিকে এগিয়ে গেলুম। বন্ধুবর আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমিও আনমনে কাপড়টা ধুতে লাগলুম।

শাড়ীখানার কায়িক অবস্থা দেখে চক্ষু স্থির হয়ে গেল। রঙবেরঙের শাড়ীখানার সব রং যেন একত্র হয়ে জগাখিচুড়ী সৃষ্টি করে ফেলল। মাঝে মাঝে রংটা উঠে গিয়ে আদি ও অকৃত্রিম সাদা রংটাও ফুটে উঠল। ভাবলুম, এই অপরূপ শাড়ী সন্দর্শনে গৃহিণীর দীর্ঘকালের বস্ত্র আকাঙ্ক্ষিত বদনে কিসের চিহ্ন রেখান্বিত হয়ে উঠবে?

তবু মনটা হর্ষবিষাদে ভরে গেল। বস্ত্রহীনতার আতিশয্যে গৃহিণী এটা গ্রহণ করেন ভালই, নইলে এটা কাচিয়ে নিয়ে যে অকৃত্রিম রংটা প্রকাশ পাবে, তাতে আমার গামছার নিগড় বাঁধন থেকে রক্ষা পাবার একটা পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। যথা লাভ।

দ্রুত পদে এগিয়ে চললুম।

সমাপ্ত